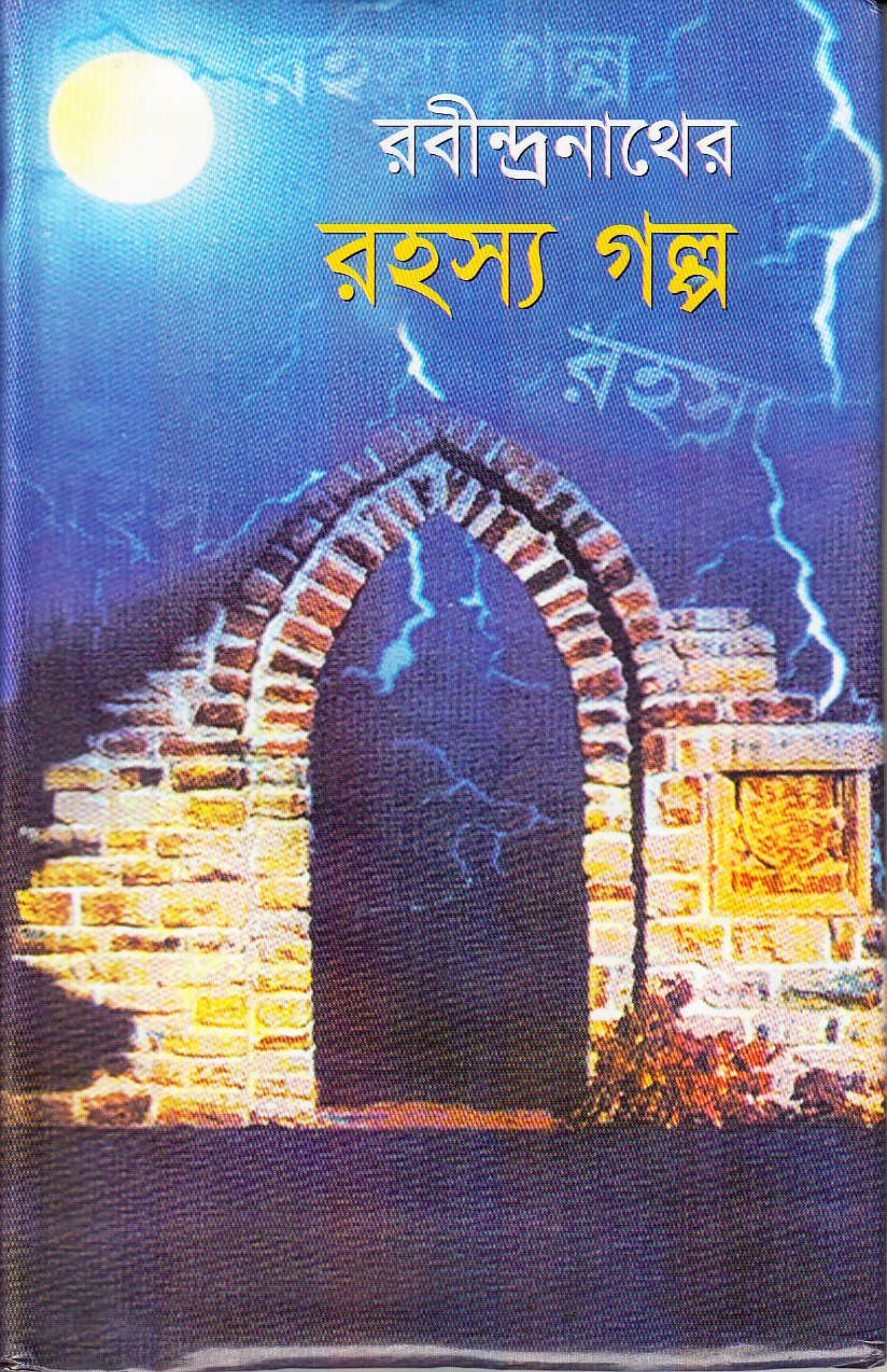
রবীন্দ্রনাথের
রহস্য গল্প

রবীন্দ্রনাথের

রহস্য গল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাতায়ন প্রকাশন
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
তৃতীয় প্রকাশ : আশ্বিন ১৪২১/ অক্টোবর ২০১৪
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফাল্গুণ ১৪১৭/ ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩/ জুন ২০০৬
প্রচ্ছদ : সিকদার আবুল বাশার
মূল্য : ১৫০ টাকা

ISBN : 978-984-474-005-1

বাতায়ন প্রকাশন-এর পক্ষে ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে প্রকাশিত এবং জি.জি. অফ্‌সেট প্রেস ৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন নয়াবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত।

কম্পিউটার কম্পোজ
গতিধারা কম্পিউটার
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

পরিবেশক : গতিধারা ৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : (+৮৮০২) ৭১১৭৫১৫, ৭১১৮২৭৩
e-mail : gatidhara2008@yahoo.com, info@gatidhara.com
fax : (+8802) 7123472, website : www.gatidhara.com

গল্প সূচি

১. কঙ্কাল..০৭
২. ডিটেক্‌টিভ..................................১৫
৩. গুপ্তধন..২৪
৪. খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন....................৪১
৫. সম্পত্তি সমর্পণ...............................৪৯
৬. নিশীথে...৫৮
৭. ক্ষুধিত পাষাণ.................................৭০
৮. পুত্রযজ্ঞ...৮২
৯. মণিহারা...৮৭
১০. মাস্টারমশায়.................................১০২
১১. অপরিচিতা.....................................১৩০
১২. বদনাম...১৪৪

কঙ্কাল

আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পণ্ডিত-মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল, আমাদিগকে সহসা সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছে যাঁহারা আমাদিগকে জানেন তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা বাহুল্য এবং যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়।

তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কঙ্কাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে, অন্বেষণ করিয়া জানা যায় না।

অল্পদিন হইল, একদিন রাত্রে কোনো কারণে অন্যত্র স্থানাভাব হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়। অনভ্যাসবশত ঘুম হইতেছে না। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে গির্জার ঘড়িতে বড়ো বড়ো ঘণ্টাগুলো প্রায় সব কটা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে ঘরের কোণে যে তেলের শেজ জ্বলিতেছিল, সেটা প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরিয়া খাবি খাইতে খাইতে একেবারে নিবিয়া গেল। ইতিপূর্বেই আমাদের বাড়িতে দুই-একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল। মনে হইল, এই-যে রাত্রি দুই প্রহরে একটি দীপশিখা চিরান্ধকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন, আর মানুষের ছোটো ছোটো প্রাণশিখা কখনো দিনে কখনো রাত্রে হঠাৎ নিবিয়া বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাও তেমনি।

ক্রমে সেই কঙ্কালের কথা মনে পড়িল। তাহার জীবিতকালের বিষয় কল্পনা করিতে করিতে সহসা মনে হইল একটি চেতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাতড়াইয়া আমার মশারির চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সে যেন কী খুঁজিতেছে, পাইতেছে না, এবং দ্রুততর বেগে ঘরময় প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম সমস্তই আমার নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা এবং আমারই মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া যে রক্ত ছুটিতেছে তাহাই দ্রুত পদশব্দের মতো শুনাইতেছে। কিন্তু তবু গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। জোর করিয়া এই অকারণ ভয় ভাঙিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম, "কেও!" পদশব্দ আমার মশারির কাছে আসিয়া থামিয়া গেল এবং একটা উত্তর শুনিতে পাইলাম, "আমি। আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজিতে আসিয়াছি।"

আমি ভাবিলাম, নিজের কাল্পনিক সৃষ্টির কাছে ভয় দেখানো কিছু নয়—

পাশবালিশটা সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া চিরপরিচিতের মতো অতি সহজ সুরে বলিলাম, "এই দুপুর রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিয়াছ। তা, সে কঙ্কালে এখন আর তোমার আবশ্যক ?"

অন্ধকারে মশারির অত্যন্ত নিকট হইতে উত্তর আসিল, "বল কী। আমার বুকের হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল। আমার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন যে তাহার চারি দিকে বিকশিত হইয়াছিল— একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না ?"

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, "হাঁ, কথাটা সঙ্গত বটে। তা, তুমি সন্ধান করো গে যাও। আমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি।"

সে বলিল, "তুমি একলা আছ বুঝি ? তবে একটু বসি। একটু গল্প করা যাক। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমিও মানুষের কাছে বসিয়া মানুষের সঙ্গে গল্প করিতাম। এই পঁয়ত্রিশটা বৎসর আমি কেবল শ্মশানের বাতাসে হুহু শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি। আজ তোমার কাছে বসিয়া আর-একবার মানুষের মতো করিয়া গল্প করি।"

অনুভব করিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নিরুপায় দেখিয়া আমি বেশ-একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম, "সেই ভালো। যাহাতে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে এমন একটা-কিছু গল্প বলো।"

সে বলিল, "সব চেয়ে মজার কথা যদি শুনিতে চাও তো আমার জীবনের কথা বলি।"

গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিল।

"যখন মানুষ ছিলাম এবং ছোটো ছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে যমের মতো ভয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বঁড়শি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইরূপ মনে হইত। অর্থাৎ কোন্‌-এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব যেন বঁড়শিতে গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিগ্ধগভীর জন্মজলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যাইতেছে— কিছুতে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। বিবাহের দুই মাস পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল এবং আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমার হইয়া অনেক বিলাপ-পরিতাপ করিলেন। আমার শ্বশুর অনেকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়া শাশুড়িকে কহিলেন, 'শাস্ত্রে যাহাকে বলে বিষকন্যা এ মেয়েটি তাই।' সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।— শুনিতেছ ? কেমন লাগিতেছে।"

আমি বলিলাম, "বেশ। গল্পের আরম্ভটি বেশ মজার।"

"তবে শোনো। আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল। লোকে আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু আমি নিজে বেশ জানিতাম, আমার মতো রূপসী এমন যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না।— তোমার কী মনে হয়।"

"খুব সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই।"

"দেখো নাই! কেন। আমার সেই কঙ্কাল। হি হি হি হি! আমি ঠাট্টা করিতেছি।

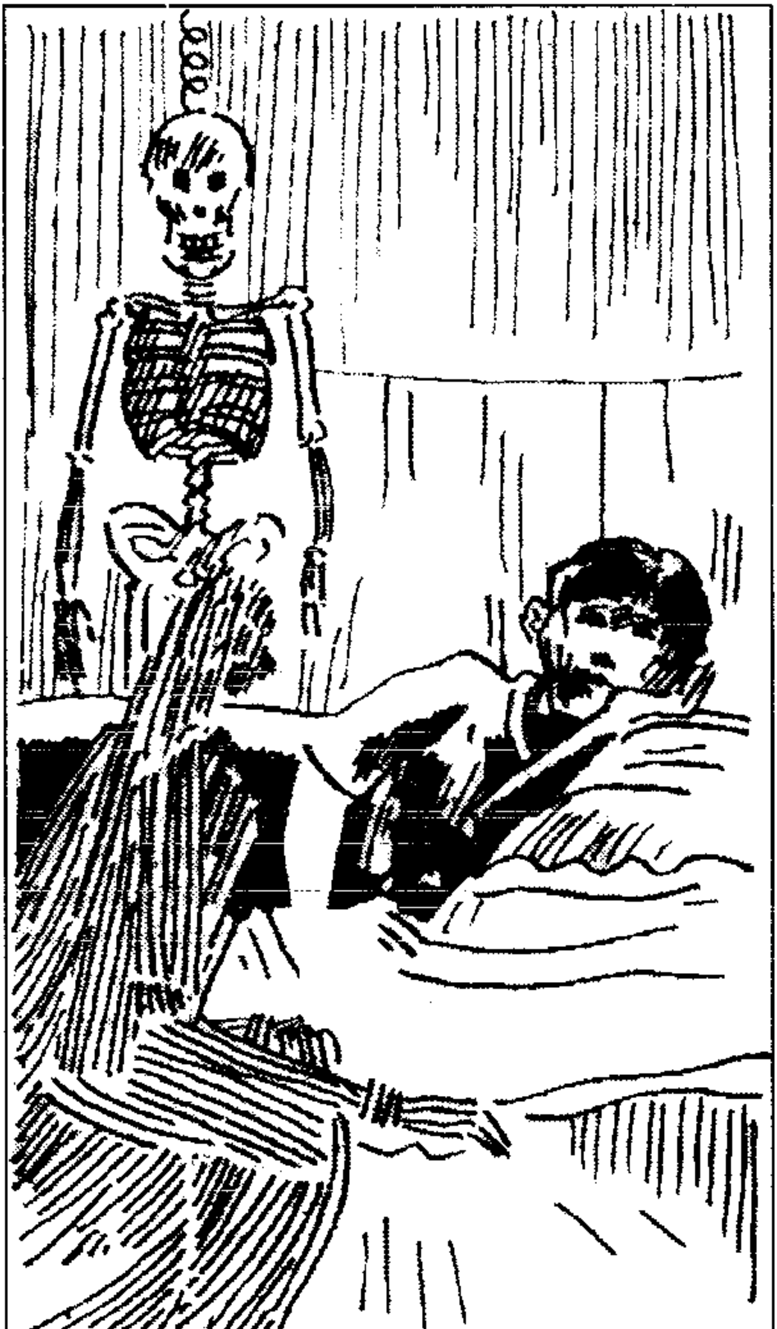

তোমার কাছে কী করিয়া প্রমাণ করিব যে, সেই দুটো শূন্য চক্ষুকোটরের মধ্যে বড়ো বড়ো টানা দুটি কালো চোখ ছিল এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃত দন্তসার বিকট হাস্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না; এবং সেই কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর এত লালিত্য এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল, তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসি পায় এবং রাগও ধরে। আমার সেই শরীর হইতে যে অস্থিবিদ্যা শেখা যাইতে পারে তাহা তখনকার বড়ো বড়ো ডাক্তারেরাও বিশ্বাস করিত না। আমি জানি, একজন ডাক্তার তাঁহার কোনো বিশেষ বন্ধুর কাছে আমাকে কনকচাঁপা বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই, পৃথিবীর আর-সকল মনুষ্যই অস্থিবিদ্যা এবং শরীরতত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল ছিল, কেবল আমিই সৌন্দর্যরূপী ফুলের মতো ছিলাম। কনকচাঁপার মধ্যে কি একটা কঙ্কাল আছে।

"আমি যখন চলিতাম তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম যে, একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারি দিক হইতে যেমন আলো ঝক্‌মক্ করিয়া উঠে আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে তেমনি সৌন্দর্যের ভঙ্গি নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারি দিকে ভাঙিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম— পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে, এমন দুইখানি হাত। সুভদ্রা যখন অর্জুনকে লইয়া দৃপ্ত ভঙ্গিতে আপনার বিজয়রথ বিস্মিত তিন লোকের মধ্য দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ করি এইরূপ দুখানি অস্থূল সুডোল বাহু, আরক্ত করতল এবং লাবণ্যশিখার মতো অঙ্গুলি ছিল।

"কিন্তু আমার সেই নির্লজ্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আমি তখন নিরুপায় নিরুত্তর ছিলাম। এইজন্য পৃথিবীর সব চেয়ে তোমার উপর আমার বেশি রাগ। ইচ্ছা করে, আমার সেই ষোলো বৎসরের জীবন্ত, যৌবনতাপে উত্তপ্ত আরক্তিম রূপখানি একবার তোমার চোখের সামনে দাঁড় করাই, বহুকালের মতো তোমার দুই চক্ষে নিদ্রা ছুটাইয়া দিক, তোমার অস্থিবিদ্যাকে অস্থির করিয়া দেশছাড়া করি।"

আমি বলিলাম, "তোমার গা যদি থাকিত তো গা ছুঁইয়া বলিতাম, সে বিদ্যার লেশমাত্র আমার মাথায় নাই। আর, তোমার সেই ভুবনমোহন পূর্ণযৌবনের রূপ রজনীর অন্ধকারপটের উপরে জাজ্বল্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর অধিক বলিতে হইবে না।"

"আমার কেহ সঙ্গিনী ছিল না। দাদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিবাহ করিবেন না। অন্তঃপুরে আমি একা। বাগানের গাছতলায় আমি একা বসিয়া ভাবিতাম, সমস্ত পৃথিবী আমাকেই ভালোবাসিতেছে, সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, বাতাস ছল করিয়া বার বার দীর্ঘনিশ্বাসে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যে তৃণাসনে পা দুটি মেলিয়া বসিয়া আছি তাহার যদি চেতনা থাকিত তবে সে পুনর্বার অচেতন হইয়া

যাইত। পৃথিবীর সমস্ত যুবাপুরুষ ঐ তৃণপুঞ্জরূপে দল বাঁধিয়া নিস্তব্ধে আমার চরণবর্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এইরূপ আমি কল্পনা করিতাম; হৃদয়ে অকারণে কেমন বেদনা অনুভব হইত।

"দাদার বন্ধু শশিশেখর যখন মেডিকাল কালেজ হইতে পাস হইয়া আসিলেন তখন তিনিই আমাদের বাড়ির ডাক্তার হইলেন। আমি তাঁহাকে পূর্বে আড়াল হইতে অনেকবার দেখিয়াছি। দাদা অত্যন্ত অদ্ভুত লোক ছিলেন। পৃথিবীটাকে যেন ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতেন না। সংসারটা যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা নয়— এইজন্য সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

"তাঁহার বন্ধুর মধ্যে এক শশিশেখর। এইজন্য বাহিরের যুবকদের মধ্যে আমি এই শশিশেখরকেই সর্বদা দেখিতাম, এবং যখন আমি সন্ধ্যাকালে পুষ্পতরুতলে সম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম তখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষজাতি শশিশেখরের মূর্তি ধরিয়া আমার চরণাগত হইত।— শুনিতেছ? কী মনে হইতেছে।"

আমি সনিশ্বাসে বলিলাম, "মনে হইতেছে, শশিশেখর হইয়া জন্মিলে বেশ হইত।"

"আগে সবটা শোনো।

"একদিন বাদলার দিনে আমার জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন। সেই প্রথম দেখা।

"আমি জানলার দিকে মুখ করিয়া ছিলাম, সন্ধ্যার লাল আভাটা পড়িয়া রুগ্‌ণ মুখের বিবর্ণতা যাহাতে দূর হয়। ডাক্তার যখন ঘরে ঢুকিয়াই আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন, তখন আমি মনে মনে ডাক্তার হইয়া কল্পনায় নিজের মুখের দিকে চাহিলাম। সেই সন্ধ্যালোকে কোমল বালিশের উপরে একটি ঈষৎক্লিষ্ট কুসুমপেলব মুখ; অসংযমিত চূর্ণকুন্তল ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং লজ্জায় আনমিত বড়ো বড়ো চোখের পল্লব কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

"ডাক্তার নম্র মৃদুস্বরে দাদাকে বলিলেন, 'একবার হাতটা দেখিতে হইবে।'

"আমি গাত্রাবরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত সুগোল হাতখানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম তো আরো বেশ মানাইত। রোগীর হাত লইয়া নাড়ী দেখিতে ডাক্তারের এমন ইতস্তত ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে কম্পিত অঙ্গুলিতে নাড়ী দেখিলেন, তিনি আমার জ্বরের উত্তাপ বুঝিলেন, আমিও তাঁহার অন্তরের নাড়ী কিরূপ চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম।— বিশ্বাস হইতেছে না?"

আমি বলিলাম, "অবিশ্বাসের কোনো কারণ দেখিতেছি না — মানুষের নাড়ী সকল অবস্থায় সমান চলে না।"

"কালক্রমে আরো দুই-চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দেখিলাম, আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস-সভায় পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষ-সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস

হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্তার এবং একটি রোগী অবশিষ্ট রহিল।

"আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিতাম, ভালো করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় একগাছি বেলফুলের মালা জড়াইতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম।

"কেন। আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃপ্তি হয় না। বাস্তবিকই হয় না। কেননা, আমি তো আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বসিয়া দুইজন হইতাম। আমি তখন ডাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মুগ্ধ হইতাম এবং ভালোবাসিতাম এবং আদর করিতাম, অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যাবাতাসের মতো হূহূ করিয়া উঠিত।

"সেই হইতে আমি আর একলা ছিলাম না। যখন চলিতাম নতনেত্রে চাহিয়া দেখিতাম পায়ের অঙ্গুলিগুলি পৃথিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে, এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের নূতন-পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারের কেমন লাগে। মধ্যাহ্নে জানালার বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিত, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, মাঝে মাঝে এক-একটা চিল অতিদূর আকাশে শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইত; এবং আমাদের উদ্যান-প্রাচীরের বাহিরে খেলেনাওয়ালা সুর করিয়া 'চাই খেলেনা চাই, চুড়ি চাই' করিয়া ডাকিয়া যাইত; আমি একখানি ধব্‌ধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম; একখানি অনাবৃত বাহু কোমল বিছানার উপরে যেন অনাদরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতখানি এমনি ভঙ্গিতে কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন দুইখানি হাত দিয়া তুলিয়া লইল, কে যেন ইহার আরক্ত করতলের উপর একটি চুম্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে — মনে করো এইখানেই গল্পটা যদি শেষ হয় তাহা হইলে কেমন হয়।"

আমি বলিলাম, "মন্দ হয় না। একটু অসম্পূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেইটুকু আপন মনে পূরণ করিয়া লইতে বাকি রাতটুকু বেশ কাটিয়া যায়।"

"কিন্তু তাহা হইলে গল্পটা যে বড়ো গম্ভীর হইয়া পড়ে। ইহার উপহাসটুকু থাকে কোথায়। ইহার ভিতরকার কঙ্কালটা তাহার সমস্ত দাঁত-ক'টি মেলিয়া দেখা দেয় কই।

"তার পরে শোনো। একটুখানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির একতলায় ডাক্তার তাঁহার ডাক্তারখানা খুলিলেন। তখন আমি তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা, বিষের কথা, কী করিলে মানুষ সহজে মরে, এই-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। ডাক্তারির কথায় ডাক্তারের মুখ খুলিয়া যাইত। শুনিয়া শুনিয়া মৃত্যু যেন পরিচিত ঘরের লোকের মতো হইয়া গেল। ভালোবাসা এবং মরণ কেবল এই দুটোকেই পৃথিবীময় দেখিলাম।

"আমার গল্প প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর বড়ো বাকি নাই।"

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।"

"কিছুদিন হইতে দেখিলাম, ডাক্তারবাবু বড়ো অন্যমনস্ক, এবং আমার কাছে যেন ভারি অপ্রতিভ। একদিন দেখিলাম, তিনি কিছু বেশিরকম সাজসজ্জা করিয়া দাদার কাছে তাঁহার জুড়ি ধার লইলেন, রাত্রে কোথায় যাইবেন।

"আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দাদার কাছে গিয়া নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাঁ দাদা, ডাক্তারবাবু আজ জুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছেন।'

"সংক্ষেপে দাদা বলিলেন, 'মরিতে।'

"আমি বলিলাম, 'না, সত্য করিয়া বলো-না।'

"তিনি পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খোলসা করিয়া বলিলেন, 'বিবাহ করিতে।'

"আমি বলিলাম, 'সত্য নাকি।' — বলিয়া অনেক হাসিতে লাগিলাম।

"অল্পে অল্পে শুনিলাম, এই বিবাহে ডাক্তার বারো হাজার টাকা পাইবেন।

"কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাৎপর্য কী। আমি কি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বুক ফাটিয়া মরিব। পুরুষদের বিশ্বাস করিবার জো নাই। পৃথিবীতে আমি একটিমাত্র পুরুষ দেখিয়াছি এবং এক মুহূর্তে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

"ডাক্তার রোগী দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে আসিলে আমি প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, 'কি ডাক্তার-মহাশয়, আজ নাকি আপনার বিবাহ।'

"আমার প্রফুল্লতা দেখিয়া ডাক্তার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারি বিমর্ষ হইয়া গেলেন।

"জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাজনা-বাদ্য কিছু নাই যে।'

"শুনিয়া তিনি ঈষৎ একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'বিবাহ ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের।'

"শুনিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথাও তো কখনো শুনি নাই। আমি বলিলাম, 'সে হইবে না, বাজনা চাই, আলো চাই।'

"দাদাকে এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম যে, দাদা তখনই রীতিমত উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আমি কেবলই গল্প করিতে লাগিলাম, বধূ ঘরে আসিলে কী হইবে, কী করিব। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা ডাক্তার-মহাশয়, তখনো কি আপনি রোগীর নাড়ী টিপিয়া বেড়াইবেন।'

"হি হি হি হি! যদিও মানুষের বিশেষত পুরুষের মনটা দৃষ্টিগোচর নয়, তবু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কথাগুলি ডাক্তারের বুকে শেলের মতো বাজিতেছিল।

"অনেক রাত্রে লগ্ন। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দুই-এক পাত্র মদ খাইতেছিলেন। দুইজনেরই এই অভ্যাসটুকু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল।

"আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাম, 'ডাক্তার-মশায় ভুলিয়া গেলেন নাকি।

যাত্রার যে সময় হইয়াছে।'

"এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তারখানায় গিয়া খানিকটা গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গুঁড়ার কিয়দংশ সুবিধামত অলক্ষিতে ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম। কোন্ গুঁড়া খাইলে মানুষ মরে ডাক্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম।

"ডাক্তার এক চুমুকে গ্লাসটি শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র গদ্‌গদ কণ্ঠে আমার মুখের দিকে মর্মান্তিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'তবে চলিলাম।'

"বাঁশি বাজিতে লাগিল। আমি একটি বারাণসী শাড়ি পরিলাম; যতগুলি গহনা সিন্দুকে তোলা ছিল সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম; সিঁথিতে বড়ো করিয়া সিঁদুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

"বড়ো সুন্দর রাত্রি। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না। সুপ্ত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। জুঁই আর বেল ফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে।

"বাঁশির শব্দ যখন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব এবং আকাশ এবং আজন্মকালের ঘরদুয়ার লইয়া পৃথিবী যখন আমার চারিদিক হইতে মায়ার মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম।

"ইচ্ছা ছিল, যখন লোকে আসিয়া আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিটুকু যেন রঙিন নেশার মতো আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়া থাকে। ইচ্ছা ছিল, যখন আমার অনন্তরাত্রির বাসর-ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিব তখন এই হাসিটুকু এখান হইতেই মুখে করিয়া লইয়া যাইব। কোথায় বাসর-ঘর! আমার সে বিবাহের বেশ কোথায়! নিজের ভিতর হইতে একটা খট্‌খট্ শব্দে জাগিয়া দেখিলাম, আমাকে লইয়া তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে! বুকের যেখানে সুখদুঃখ ধুক্‌ধুক্ করিত এবং যৌবনের পাপড়ি প্রতিদিন একটি একটি করিয়া প্রস্ফুটিত হইত, সেইখানে বেত্র নির্দেশ করিয়া কোন্ অস্থি'র কী নাম মাস্টার শিখাইতেছে। আর সেই যে অন্তিম হাসিটুকু ওষ্ঠের কাছে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলে কি।

"গল্পটা কেমন লাগিল।"

আমি বলিলাম, "গল্পটি বেশ প্রফুল্লকর।"

এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখনো আছ কি।" কোনো উত্তর পাইলাম না।

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

ফাল্গুন ১২৯৮

ডিটেক্‌টিভ

আমি পুলিসের ডিটেক্‌টিভ কর্মচারী। আমার জীবনে দুটিমাত্র লক্ষ্য ছিল—আমার স্ত্রী এবং আমার ব্যবসায়। পূর্বে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে ছিলাম, সেখানে আমার স্ত্রীর প্রতি সমাদরের অভাব হওয়াতেই আমি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসি। দাদাই উপার্জন করিয়া আমাকে পালন করিতেছিলেন, অতএব সহসা সস্ত্রীক তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসা আমার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ হইয়াছিল।

কিন্তু কখনো নিজের উপর আমার বিশ্বাসের ত্রুটি ছিল না। আমি নিশ্চয় জানিতাম, সুন্দরী স্ত্রীকে যেমন বশ করিয়াছি বিমুখ অদৃষ্টলক্ষ্মীকেও তেমনি বশ করিতে পারিব। মহিমচন্দ্র এ সংসারে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

পুলিস-বিভাগে সামান্যভাবে প্রবেশ করিলাম, অবশেষে ডিটেক্‌টিভ পদে উত্তীর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

উজ্জ্বল শিখা হইতেও যেমন কজ্জলপাত হয় তেমনি আমার স্ত্রীর প্রেম হইতেও ঈর্ষা এবং সন্দেহের কালিমা বাহির হইত। সেটাতে আমার কিছু কাজের ব্যাঘাত করিত, কারণ পুলিসের কর্মে স্থানাস্থান কালাকাল বিচার করিলে চলে না, বরঞ্চ স্থানের অপেক্ষা অস্থান এবং কালের অপেক্ষা অকালটারই চর্চা অধিক করিয়া করিতে হয়—তাহাতে করিয়া আমার স্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহ আরো যেন দুর্নিবার হইয়া উঠিত। সে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিত, "তুমি এমন যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাপন কর, কালেভদ্রে আমার সঙ্গে দেখা হয়, আমার জন্য তোমার আশঙ্কা হয় না?" আমি তাহাকে বলিতাম, "সন্দেহ করা আমাদের ব্যবসায়, সেই কারণে ঘরের মধ্যে সেটাকে আর আনি না।"

স্ত্রী বলিত, "সন্দেহ করা আমার ব্যবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব, আমাকে তুমি লেশমাত্র সন্দেহের কারণ দিলে আমি সব করিতে পারি।"

ডিটেক্‌টিভ-লাইনে আমি সকলের সেরা হইব, একটা নাম রাখিব, এ প্রতিজ্ঞা আমার দৃঢ় ছিল। এ সম্বন্ধে যতকিছু বিবরণ এবং গল্প আছে তাহার কোনোটাই পড়িতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু পড়িয়া কেবল মনের অসন্তোষ এবং অধীরতা বাড়িতে লাগিল।

কারণ, আমাদের দেশের অপরাধীগুলা ভীরু এবং নির্বোধ, অপরাধগুলা নির্জীব এবং সরল, তাহার মধ্যে দুরূহতা দুর্গমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের খুনী নররক্তপাতের উৎকট উত্তেজনা কোনোমতেই নিজের মধ্যে সংবরণ করিতে পারে না। জালিয়াত যে জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলম্বে নিজেই আপাদমস্তক জড়াইয়া পড়ে, অপরাধব্যূহ হইতে নির্গমনের কূটকৌশল সে কিছুই জানে না। এমন নির্জীব দেশে ডিটেক্‌টিভ কাজে সুখও নাই, গৌরবও নাই।

বড়োবাজারের মাড়োয়ারী জুয়াচোরকে অনায়াসে গ্রেফতার করিয়া কতবার মনে মনে বলিয়াছি, 'ওরে অপরাধীকুলকলঙ্ক, পরের সর্বনাশ করা গুণী ওস্তাদলোকের কর্ম; তোর মতো আনাড়ি নির্বোধের সাধুতপস্বী হওয়া উচিত ছিল।' খুনীকে ধরিয়া তাহার প্রতি স্বগত উক্তি করিয়াছি, 'গবর্মেন্টের সমুন্নত ফাঁসিকাষ্ঠ কি তোদের মতো গৌরববিহীন প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল—তোদের না আছে উদার কল্পনাশক্তি, না আছে কঠোর আত্মসংযম, তোরা বেটারা খুনী হইবার স্পর্ধা করিস!'

আমি কল্পনাচক্ষে যখন লন্ডন এবং প্যারিসের জনাকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে শীতবাষ্পাকুল অভ্রভেদী হর্ম্যশ্রেণী দেখিতে পাইতাম তখন আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। মনে মনে ভাবিতাম, 'এই হর্ম্যরাজি এবং পথ-উপপথের মধ্য দিয়া যেমন জনস্রোত কর্মস্রোত উৎসবস্রোত সৌন্দর্যস্রোত অহরহ বহিয়া যাইতেছে, তেমনি সর্বত্রই একটা হিংস্রকুটিল কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ংকর অপরাধপ্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিয়া চলিয়াছে; তাহারই সামীপ্যে য়ুরোপীয় সামাজিকতার হাস্যকৌতুক শিষ্টাচার এমন বিরাট্‌ভীষণ রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। আর, আমাদের কলিকাতার পথপার্শ্বের মুক্তবাতায়ন গৃহশ্রেণীর মধ্যে রান্নাবাটনা, গৃহকার্য, পরীক্ষার পাঠ, তাস-দাবার বৈঠক, দাম্পত্যকলহ, বড়োজোর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এবং মকদ্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছু নাই—কোনো-একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কখনো এ কথা মনে হয় না যে, হয়তো এই মুহূর্তেই এই গৃহের কোনো-একটা কোণে শয়তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিমগুলিতে তা দিতেছে।

আমি অনেক সময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকের মুখ এবং চলনের ভাব পর্যবেক্ষণ করিতাম; ভাবে ভঙ্গিতে যাহাদিগকে কিছুমাত্র সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেক সময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি, তাহাদের নামধাম ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে পরম নৈরাশ্যের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি—তাহারা নিষ্কলঙ্ক ভালোমানুষ, এমন-কি তাহাদের আত্মীয়-বান্ধবেরাও তাহাদের সম্বন্ধে আড়ালে কোনোপ্রকার গুরুতর মিথ্যা অপবাদও প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সবচেয়ে যাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমন-কি যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি যে, এইমাত্র সে কোনো-একটা উৎকট দুষ্কার্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি—সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, তখনই অধ্যাপনাকার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এই-সকল লোকেরাই অন্য কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোর-ডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনীশক্তি এবং যথেষ্ট পরিমাণ পৌরুষের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পণ্ডিতি করিয়া বৃদ্ধবয়সে পেন্সন লইয়া মরে; বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পণ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার যেরূপ সুগভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল কোনো অতিক্ষুদ্র ঘটিবাটিচোরের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই বাসার অনতিদূরে একটি

গ্যাস্‌পোস্টের নীচে একটা মানুষ দেখিলাম, বিনা আবশ্যকে সে উৎসুকভাবে একই স্থানে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, সে একটি-কোনো গোপন দুরভিসন্ধির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। নিজে অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার চেহারাখানা বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইলাম—তরুণ বয়স, দেখিতে সুশ্রী; আমি মনে মনে কহিলাম, 'দুষ্কর্ম করিবার এই তো ঠিক উপযুক্ত চেহারা; নিজের মুখশ্রীই যাহাদের সর্বপ্রধান বিরুদ্ধ সাক্ষী তাহারা যেন সর্বপ্রকার অপরাধের কাজ সর্বযত্নে পরিহার করে; সৎকার্য করিয়া তাহারা নিষ্ফল হইতে পারে কিন্তু দুষ্কর্ম দ্বারা সফলতা লাভও তাহাদের পক্ষে দুরাশা।' দেখিলাম, এই ছোকরাটির চেহারাটাই ইহার সর্বপ্রধান বাহাদুরি; সেজন্য আমি মনে মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তারিফ করিলাম, বলিলাম, 'ভগবান তোমাকে যে দুর্লভ সুবিধাটি দিয়াছেন সেটাকে রীতিমতো কাজে খাটাইতে পার, তবে তো বলি সাবাস।'

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই পৃষ্ঠে চপেটাঘাতপূর্বক বলিলাম, "এই যে, ভালো আছেন তো?" সে তৎক্ষণাৎ প্রবলমাত্রায় চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "মাপ করিবেন, ভুল হইয়াছে, হঠাৎ আপনাকে অন্য লোক ঠাওরাইয়াছিলাম।" মনে করিলাম, কিছুমাত্র ভুল করি নাই, যাহা ঠাওরাইয়াছিলাম তাই বটে। কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল, ইহাতে আমি কিছু ক্ষুণ্ণ হইলাম। নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরো অধিক দখল থাকা উচিত ছিল; কিন্তু শ্রেষ্ঠতার সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধীশ্রেণীর মধ্যেও বিরল। চোরকেও সেরা চোর করিয়া তুলিতে প্রকৃতি কৃপণতা করিয়া থাকে।

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে ত্রস্তভাবে গ্যাস্‌পোস্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে গেলাম, দেখিলাম, গোলদিঘির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীতীরে তৃণশয্যার উপর চিত হইয়া শুইয়া পড়িল; ভাবিলাম, উপায়চিন্তার এ একটা স্থান বটে, গ্যাস্‌পোস্টের তলদেশের অপেক্ষা অনেকাংশে ভালো—লোকে যদি কিছু সন্দেহ করে তো বড়োজোর এই ভাবিতে পারে যে, ছোকরাটি অন্ধকার আকাশে প্রেয়সীর মুখচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অভাব পূরণ করিতেছে। ছেলেটির প্রতি উত্তরোত্তর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনুসন্ধান করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মন্মথ তাহার নাম, সে কলেজের ছাত্র, পরীক্ষা ফেল করিয়া গ্রীষ্মাবকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশকালে সকল ছাত্রই বাসা ছাড়িয়া পালায়, এই লোকটিকে কোন্ দুষ্টগ্রহ ছুটি দিতেছে না সেটা বাহির করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বাসার এক অংশ গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিন যখন সে আমাকে দেখিল, কেমন একরকম করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল তাহার ভাবটা ভালো বুঝিলাম না। যেন সে বিস্মিত, যেন সে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে

পারিয়াছে, এমনি একটা ভাব। বুঝিলাম, শিকারির উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজাভাবে ফস্ করিয়া কায়দা করা যাইবে না।

অথচ যখন তাহার সহিত প্রণয়বন্ধনের চেষ্টা করিলাম তখন সে ধরা দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। কিন্তু মনে হইল, সেও আমাকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে, সেও আমাকে চিনিতে চায়। মনুষ্যচরিত্রের প্রতি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতূহল, ইহা ওস্তাদের লক্ষণ। এত অল্প বয়সে এতটা চাতুরী দেখিয়া বড়ো খুশি হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকালধূর্ত ছেলেটির হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করা সহজ হইবে না।

একদিন গদগদ্‌কণ্ঠে মন্মথকে বলিলাম, "ভাই, একটি স্ত্রীলোককে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না।"

প্রথমটা সে যেন কিছু চকিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "এরূপ দুর্যোগ বিরল নহে। এইপ্রকার মজা করিবার জন্যই কৌতুকপর বিধাতা নরনারীর প্রভেদ করিয়াছেন।"

আমি কহিলাম, "তোমার পরামর্শ ও সাহায্য চাহি।" সে সম্মত হইল।

আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইতিহাস কহিলাম; সে সাগ্রহে কৌতূহলে সমস্ত কথা শুনিল, কিন্তু অধিক কথা কহিল না। আমার ধারণা ছিল, ভালোবাসার, বিশেষত গর্হিত ভালোবাসার, ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলে মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গতা দ্রুত বাড়িয়া উঠে; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, ছোকরাটি পূর্বাপেক্ষা যেন চুপ মারিয়া গেল, অথচ সকল কথা যেন মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভক্তির সীমা রহিল না।

এদিকে মন্মথ প্রত্যহ গোপনে দ্বার রোধ করিয়া কী করে, এবং তাহার গোপন অভিসন্ধি কিরূপে কতদূর অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না, অথচ অগ্রসর হইতেছিল তাহার সন্দেহ নাই। কী একটা নিগূঢ় ব্যাপারে সে ব্যাপৃত আছে এবং সম্প্রতি সেটা অত্যন্ত পরিপক্ব হইয়াছে, তাহা এই নবযুবকটির মুখ দেখিবামাত্র বুঝা যাইত। আমি গোপন চাবিতে তাহার ডেস্ক খুলিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে একটা অত্যন্ত দুর্বোধ কবিতার খাতা, কলেজের বক্তৃতার নোট এবং বাড়ির লোকের গোটাকতক অকিঞ্চিৎকর চিঠি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল বাড়ির চিঠি হইতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে, বাড়ি ফিরিবার জন্য আত্মীয়স্বজন বারংবার প্রবল অনুরোধ করিয়াছে; তথাপি তৎসত্ত্বেও বাড়ি না যাইবার একটা সংগত কারণ অবশ্য আছে; সেটা যদি ন্যায়সংগত হইত তবে নিশ্চয় কথায় কথায় এতদিনে ফাঁস হইত, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকাতেই এই ছোকরাটির গতিবিধি এবং ইতিহাস আমার কাছে এমন নিরতিশয় ঔৎসুক্যজনক হইয়াছে—যে অসামাজিক মনুষ্যসম্প্রদায় পাতালতলে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া এই বৃহৎ মনুষ্যসমাজকে সর্বদাই নিচের দিক হইতে দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছে, এই

বালকটি সেই বিশ্বব্যাপী বহু পুরাতন বৃহৎজাতির একটি অঙ্গ, এ সামান্য একজন স্কুলের ছাত্র নহে; এ জগৎবক্ষবিহারিণী সর্বনাশিনীর একটি প্রলয়সহচর; আধুনিককালের চশমাপরা নিরীহ বাঙালি ছাত্রের বেশে কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে, নৃমুণ্ডধারী কাপালিক বেশে ইহার ভৈরবতা আমার নিকট আরো ভৈরবতর হইত না; আমি ইহাকে ভক্তি করি।

অবশেষে সশরীরে রমণীর অবতারণা করিতে হইল। পুলিসের বেতনভোগী হরিমতি আমার সহায় হইল। মন্মথকে জানাইলাম, আমি এই হরিমতির হতভাগ্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি কিছুদিন গোলদিঘির ধারে মন্মথের পার্শ্বচর হইয়া 'আবার গগনে কেন সুধাংশু-উদয় রে' কবিতাটি বারংবার আবৃত্তি করিলাম; এবং হরিমতিও কতকটা অন্তরের সহিত, কতকটা লীলাসহকারে জানাইল যে, তাহার চিত্ত সে মন্মথকে সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল হইল না, মন্মথ সুদূর নির্লিপ্ত অবিচলিত কৌতূহলের সহিত সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন মধ্যাহ্নে তাহার ঘরের মেঝেতে একখানি চিঠির গুটিকতক ছিন্নাংশ কুড়াইয়া পাইলাম। জোড়া দিয়া দিয়া এই অসম্পূর্ণ বাক্যটুকু আদায় করিলাম, "আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় গোপনে তোমার বাসায়"—অনেক খুঁজিয়া আর কিছু বাহির করিতে পারিলাম না।

আমার অন্তঃকরণ পুলকিত হইয়া উঠিল; মাটির মধ্য হইতে কোনো বিলুপ্তবংশ প্রাচীন প্রাণীর একখণ্ড হাড় পাইলে প্রত্নজীবতত্ত্ববিদের কল্পনা যেমন মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠে আমারও সেই অবস্থা হইল।

আমি জানিতাম, আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের বাসায় হরিমতির আবির্ভাব হইবার কথা আছে, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটার সময ব্যাগারখানা কী। ছেলেটির যেমন সাহস তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। যদি কোনো গোপন অপরাধের কাজ করিতে হয় তবে ঘরে যেদিন কোনো-একটা বিশেষ হাঙ্গামা সেইদিন অবকাশ বুঝিয়া করা ভালো। প্রথমত প্রধান ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে, দ্বিতীয়ত যেদিন যেখানে কোনো বিশেষ সমাগম আছে সেদিন সেখানে কেহ ইচ্ছাপূর্বক কোনো গোপন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে ইহা কেহ সম্ভব মনে করে না।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল যে, আমার সহিত এই নূতন বন্ধুত্ব এবং হরিমতির সহিত এই প্রেমাভিনয়, ইহাকেও মন্মথ আপন কার্যসিদ্ধির উপায় করিয়া লইয়াছে; এইজন্যই সে আপনাকে ধরাও দেয় না, আপনাকে ছাড়াইয়াও লয় না। আমরা তাহাকে তাহার গোপন কার্য হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছি; সকলেই মনে করিতেছে যে সে আমাদিগকে লইয়াই ব্যাপৃত রহিয়াছে—সেও সেই ভ্রম দূর করিতে চায় না।

তর্কগুলা একবার ভাবিয়া দেখো। যে বিদেশী ছাত্র ছুটির সময় আত্মীয়স্বজনের অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করিয়া শূন্য বাসায় একলা পড়িয়া থাকে, নির্জন স্থানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না, অথচ আমি

তাহ'র বাসায় আসিয়া তাহার নির্জনতা ভঙ্গ করিয়াছি, এবং একটা রমণীর অবতারণা করিয়া নূতন উপদ্রব সৃজন করিয়াছি; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে বিরক্ত হয় না, বাসা ছাড়ে না, আমাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকে না—অথচ হরিমতি অথবা আমার প্রতি তাহার তিলমাত্র আসক্তি জন্মে নাই ইহা নিশ্চয় সত্য, এমন-কি তাহার অসতর্ক অবস্থায় বারংবার লক্ষ করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের উভয়ের প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ঘৃণা ক্রমেই যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার একমাত্র তাৎপর্য এই যে, সজনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার সুবিধাটুকু ভোগ করিতে হইলে আমার মতো নবপরিচিত লোককে নিকটে রাখা সর্বাপেক্ষা সদুপায়; এবং কোনো বিষয়ে একান্তমনে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে রমণীর মতো এমন সহজ ছুতা আর কিছু নাই। ইতিপূর্বে মন্মথর আচরণ যেরূপ নিরর্থক এবং সন্দেহজনক ছিল, আমাদের আগমনের পর তাহার সম্পূর্ণ লোপ হইল। কিন্তু এতটা দূরের কথা মুহূর্তের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এত বড়ো মৎলবী লোক যে আমাদের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল—মন্মথ কিছু যদি মনে না করিত তবে আমি বোধহয় তাহাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পারিতাম।

সেদিন মন্মথর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তাহাকে বলিলাম, "আজ তোমাকে সন্ধ্যা সাতটার সময় হোটেলে খাওয়াইব সংকল্প করিয়াছি।" শুনিয়া সে একটু চমকিয়া উঠিল, পরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "ভাই, মাপ করো, আমার পাকযন্ত্রের অবস্থা আজ বড়ো শোচনীয়।" হোটেলের খানায় মন্মথর কখনো কোনো কারণে অনভিরুচি দেখি নাই, আজ তাহার অন্তরিন্দ্রিয় নিশ্চয়ই নিতান্তই দুরূহ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বভাগে আমার বাসায় থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন গায়ে পড়িয়া নানা কথা পাড়িয়া বৈকালের দিকে কিছুতেই আর উঠিবার গা করিলাম না। মন্মথ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, আমার সকল মতের সঙ্গেই সে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিল, কোনো তর্কের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। অবশেষে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হরিমতিকে আজ আনিতে যাইবে না?" আমি সচকিত ভাবে কহিলাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি ভাই আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখো, আমি ঠিক সাড়ে দশটা রাত্রে তাহাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।" এই বলিয়া চলিয়া গেলাম।

আনন্দের নেশা আমার সর্বশরীরের রক্তের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার প্রতি মন্মথের যে প্রকার ঔৎসুক্য দেখিলাম আমার ঔৎসুক্য তদপেক্ষা অল্প ছিল না; আমি আমাদের বাসার অনতিদূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রেয়সীসমাগমোৎকণ্ঠিত প্রণয়ীর ন্যায় মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। গোধূলির

অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যখন রাজপথে গ্যাস জ্বালিবার সময় হইল এমন সময় একটি রুদ্ধদ্বার পাল্‌কি আমাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ আচ্ছন্ন পাল্‌কিটির মধ্যে একটি অশ্রুসিক্ত অবগুণ্ঠিত পাপ, একটি মূর্তিমতী ট্রাজেডি কলেজের ছাত্রনিবাসের মধ্যে গুটিকতক উড়ে বেহারার স্কন্ধে চাপিয়া সমুচ্চ হাঁই-হুঁই শব্দে অত্যন্ত অনায়াসে সহজভাবে প্রবেশ করিতেছে কল্পনা করিয়া আমার সর্বশরীরে অপূর্ব পুলকসঞ্চার হইল।

আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। অনতিকাল পরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিলাম। ইচ্ছা ছিল, গোপনে লুকাইয়া দেখিয়া-শুনিয়া লইব, কিন্তু তাহা ঘটিল না; কারণ সিঁড়ির সম্মুখবর্তী ঘরেই সিঁড়ির দিকে মুখ করিয়া মন্মথ বসিয়া ছিল, এবং গৃহের অপর প্রান্তে বিপরীতমুখে একটি অবগুণ্ঠিতা নারী বসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। যখন দেখিলাম মন্মথ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, "ভাই, আমার ঘড়িটা ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাই লইতে আসিলাম।" মন্মথ এমনি অভিভূত হইয়া পড়িল যে, বোধ হইল যেন তখনি সে মাটিতে পড়িয়া যাইবে। আমি কৌতুক এবং আনন্দে নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, "ভাই, তোমার অসুখ করিয়াছে নাকি।" সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। তখন সেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ আড়ষ্ট অবগুণ্ঠিত নারীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মন্মথর কে হন।" কোনো উত্তর পাইলাম না, কিন্তু দেখিলাম, তিনি মন্মথর কেহই হন না, আমারই স্ত্রী হন। তাহার পর কী হইল সকলে জানেন।

এই আমার ডিটেক্‌টিভ-পদের প্রথম চোর ধরা।

আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ডিটেক্‌টিভ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম, "মন্মথর সহিত তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধ সমাজবিরুদ্ধ না হইতেও পারে।"

মহিম কহিল, "না হইবারই সম্ভব। আমার স্ত্রীর বাক্স হইতে মন্মথর এই চিঠিখানি পাওয়া গেছে।" বলিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল; সেখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

সুচরিতাসু,

হতভাগ্য মন্মথর কথা তুমি বোধ করি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ। বাল্যকালে যখন কাজিবাড়ির মাতুলালয়ে যাইতাম, তখন সর্বদাই সেখান হইতে তোমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙিয়া গেছে। তুমি জান কি না বলিতে পারি না, একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া এবং লজ্জার মাথা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ-চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় এক বলিয়া উভয় পক্ষেরই কর্তারা কোনোক্রমে রাজি হইলেন না।

তাহার পর তোমার বিবাহ হইয়া গেলে চার-পাঁচ বৎসর তোমার আর কোনো সন্ধান পাই নাই আজ পাঁচ মাস হইল তোমার স্বামী কলিকাতার পুলিসের কর্ম লইয়া শহরে বদলি হইয়াছেন, খবর পাইয়া আমি তোমাদের বাসা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

তোমার সহিত সাক্ষাতের দুরাশা আমার নাই এবং অন্তর্যামী জানেন, তোমার গার্হস্থ্যসুখের মধ্যে উপদ্রবের মতো প্রবেশ করিবার দুরভিসন্ধিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সম্মুখবর্তী একটি গ্যাস্‌পোস্টের তলে আমি সূর্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি ঠিক সাড়ে সাতটার সময় একটি প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প লইয়া প্রত্যহ নিয়মিত তোমাদের দোতলার দক্ষিণদিকের ঘরের কাচের জানলাটির সম্মুখে স্থাপন কর; সেই সময় মুহূর্তকালের জন্য তোমার দীপালোকিত প্রতিমাখানি আমার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তোমার সম্বন্ধে আমার এই একটিমাত্র অপরাধ।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে তোমার স্বামীর সহিত আমার আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র যেরূপ দেখিলাম তাহাতে বুঝিতে বাকি নাই যে, তোমার জীবন সুখের নহে। তোমার প্রতি আমার কোনোপ্রকার সামাজিক অধিকার নাই কিন্তু যে বিধাতা তোমার দুঃখকে আমার দুঃখে পরিণত করিয়াছেন, তিনিই সে দুঃখ মোচনের চেষ্টা-ভার আমার উপরেই স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব আমার স্পর্ধা মাপ করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সাতটার সময় গোপনে পাল্‌কি করিয়া একবার বিশ মিনিটের জন্য আমার বাসায় আসিলে আমি তোমাকে তোমার স্বামী সম্বন্ধে কতকগুলি গোপনকথা বলিতে চাহি, যদি বিশ্বাস না কর এবং যদি সহ্য করিতে পার তবে তৎসম্বন্ধে প্রমাণও দেখাইতে পারি, এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি; আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া আশা করিতেছি, সেই পরামর্শমত চলিলে তুমি একদিন সুখী হইতে পারিবে।

আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নহে; ক্ষণকালের জন্য তোমাকে সম্মুখে দেখিব, তোমার কথা শুনিব এবং তোমার চরণতলস্পর্শে আমার গৃহখানিকে চিরকালের জন্য সুখস্বপ্নমণ্ডিত করিয়া তুলিব, এ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তরে আছে। যদি আমাকে বিশ্বাস না কর এবং যদি এ সুখ হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও তবে সে কথা আমাকে লিখিয়ো, আমি তদুত্তরে পত্রযোগেই সকল কথা জানাইব। যদি চিঠি লিখিবার বিশ্বাসও না থাকে তবে আমার এই পত্রখানি তোমার স্বামীকে দেখাইয়ো, তাহার পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা তাঁহাকেই বলিব।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রী মন্মথনাথ মজুমদার

আষাঢ় ১৩০৫

গুপ্তধন

অমাবস্যার নিশীথরাত্রি। মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসিয়াছে। পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল, তখন নিকটস্থ আম্রবাগান হইতে প্রত্যুষের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। তখন সে একবার দেবীর চরণতলে মস্তক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নিচে হইতে একটি কাঁঠালকাঠের বাক্স বাহির হইল। পৈতায় চাবি বাঁধা ছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিল। খুলিবামাত্রই চমকিয়া উঠিয়া মাথায় করাঘাত করিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় অন্ধকারে এই ছোটো মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর মূর্তি ছাড়া আর-কিছুই নাই; তাহার প্রবেশদ্বার একটিমাত্র। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিবার পূর্বে তাহা বন্ধই ছিল—কেহ তাহা ভাঙে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশবার করিয়া প্রতিমার চারি দিকে ঘুরিয়া হাতড়াইয়া দেখিল—কিছুই পাইল না। পাগলের মতো হইয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল—তখন ভোরের আলো ফুটিতেছে। মন্দিরের চারিদিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথা আশ্বাসে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালবেলাকার আলোক যখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন সে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর ক্লান্তশরীরে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, "জয় হোক বাবা।"

সম্মুখে প্রাঙ্গণে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। মৃত্যুঞ্জয় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি মনের মধ্যে বৃথা শোক করিতেছ!"

শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য হইয়া উঠিল; কহিল, "আপনি অন্তর্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া বুঝিলেন। আমি তো কাহাকেও কিছু বলি নাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, আমি বলিতেছি, তোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ করো, শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আপনি তবে তো সমস্তই জানিয়াছেন— কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব, তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু, ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজন্য শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সমস্ত দিন বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিল। পরদিন প্রত্যুষে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিয়া সফেন দুগ্ধ দুহিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল, সন্ন্যাসী নাই।

২

মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশু ছিল, যখন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তখন এমনি করিয়াই একটি সন্ন্যাসী 'জয় হোক বাবা' বলিয়া এই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাখিয়া বিধিমতো সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিল।

বিদায়কালে সন্ন্যাসী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি চাও", হরিহর কহিল, "বাবা, যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুনুন। এক কালে এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্ধিষ্ণু ছিলাম। আমার প্রপিতামহ দূর হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৌহিত্রবংশ আমাদিগকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়োলোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভালো নয়, কাজেই ইহাদের অহংকার সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আর সহ্য হয় না। কী করিলে, আবার আমাদের বংশ বড়ো হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্বাদ করুন।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, ছোটো হইয়া সুখে থাকো। বড়ো হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখি না।"

কিন্তু, হরিহর তবু ছাড়িল না, বংশকে বড়ো করিবার জন্য সে সমস্ত স্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলি হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মতো গুটানো। সন্ন্যাসী সেটি মেজের উপরে খুলিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা, আর, সকলের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে তাহার আরম্ভটা এইরূপ —

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা ॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা ॥
তেঁতুল বটের কোলে

দক্ষিণে যাও চলে ॥
ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী। ইত্যাদি।

হরিহর কহিল, "বাবা, কিছুই তো বুঝিলাম না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর পূজা করো। তাঁহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ না কেহ এই লিখন বুঝিতে পারিবে। তখন সে এমন ঐশ্বর্য পাইবে জগতে যাহার তুলনা নাই।"

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল, "বাবা কি বুঝাইয়া দিবেন না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "না। সাধনা দ্বারা বুঝিতে হইবে।"

এমন সময় হরিহরের ছোটো ভাই শংকর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লিখনটি লুকাইবার চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "বড়ো হইবার পথের দুঃখ এখন হইতেই শুরু হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ, ইহার রহস্য কেবল একজনমাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেষ্টা করিলেও আর-কেহ তাহা পারিবে না। তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে, তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভয়ে খুলিয়া রাখিতে পারো।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর-কেহ ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোটো ভাই শংকর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় হরিহর এই কাগজটি একটি কাঁঠালকাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীথরাত্রে দেবীর পূজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি খুলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অর্থ বুঝিবার শক্তি দেন।

শংকর কিছুদিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, "দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও-না।"

হরিহর কহিল, "দূর পাগল, সে কাগজ কি আছে। বেটা ভণ্ড সন্ন্যাসী কাগজে কতকগুলা হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল—আমি সে কাগজ পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।"

শংকর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শংকরকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নিরুদ্দেশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম নষ্ট হইল; গুপ্ত ঐশ্বর্যের ধ্যান এক মুহূর্ত সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড়ো ছেলে শ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসীদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকরি ছাড়িয়া দিল। জয়কালীর পূজায় আর একান্তমনে এই লিখনপাঠের চর্চায় তাহার জীবনটা যে কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিল না।

মৃত্যুঞ্জয় শ্যামাপদর বড়ো ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে এই সন্ন্যাসীদত্ত গুপ্তলিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ঐ কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্রে পূজার পর লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না—সন্ন্যাসীও কোথায় অন্তর্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সন্ধান ইহার কাছ হইতেই মিলিবে।"

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে বাহির হইল। এক বৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

৩

গ্রামের নাম ধারাগোল। সেখানে মৃত্যুঞ্জয় মুদির দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল আর অন্যমনস্ক হইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দূরে মাঠের ধার দিয়া একজন সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। একটু পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোকটা চলিয়া গেল এই তো সেই সন্ন্যাসী! তাড়াতাড়ি হুঁকাটা রাখিয়া মুদিকে সচকিত করিয়া এক দৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু, সে সন্ন্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে কোথায় যে সন্ন্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে, তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া মুদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ-যে মস্ত বন দেখা যাইতেছে ওখানে কী আছে।"

মুদি কহিল, "এককালে ঐ বন শহর ছিল, কিন্তু অগস্ত্য মুনির শাপে ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে, ওখানে অনেক ধনরত্ন আজও খুঁজিলে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনদুপুরেও ঐ বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।"

মৃত্যুঞ্জয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি মুদির দোকানে মাদুরের উপর পড়িয়া মশার জ্বালায় সর্বাঙ্গ চাপড়াইতে লাগিল আর ঐ বনের কথা, সন্ন্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল, তাই এই অনিদ্রাবস্থায় কেবলই তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল—

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা ॥

শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা ॥

মাথা গরম হইয়া উঠিল—কোনোমতেই এই কটা ছত্র সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। 'রা নাহি দেয় রাধা' অতএব 'রাধা'র 'রা' না থাকিলে 'ধা' রহিল—'শেষে দিল রা' অতএব হইল 'ধারা'—'পাগোল ছাড়ো পা', 'পাগোল'-এর পা ছাড়িলে 'গোল' বাকি রহিল—অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল 'ধারাগোল'—এ জায়গাটার নাম তো 'ধারাগোল'ই বটে।

স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।

৪

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহু কষ্টে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রামে ফিরিল।

পরদিন চাদরে চিঁড়া বাঁধিয়া পুনর্বার সে বনের মধ্যে যাত্রা করিল। অপরাহ্ণে একটা দিঘির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিঘির মাঝখানটা পরিষ্কার জল, আর পাড়ের গায়ে গায়ে চারিদিকে পদ্ম আর কুমুদের বন। পাথরে বাঁধানো ঘাট ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে জলে চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়া দিঘির চারি দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

দিঘির পশ্চিম পাড়ের প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, একটা তেঁতুলগাছকে বেষ্টন করিয়া প্রকাণ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—

তেঁতুল বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে ॥

দক্ষিণে কিছু দূর যাইতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক, মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল, এই গাছটাকে কোনোমতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অন্তরাল দিয়া অনতি দূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, নিকটে একটা চুল্লি, পোড়া কাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভগ্নদ্বার মন্দিরের মধ্যে উঁকি মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল কমণ্ডলু আর গেরুয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহু দূরে, অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ

সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না, তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুশি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙিয়া দ্বারের কাছে পড়িয়া ছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পাথরের গায়ে কী যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে কতক স্পষ্ট কতক লুপ্তপ্রায়-ভাবে নিম্নলিখিত সাংকেতিক অক্ষর লেখা আছে—

এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের সুপরিচিত। কত অমাবস্যারাত্রে পূজাগৃহে সুগন্ধ ধূপের ধূমে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অঙ্কিত এ চক্রচিহ্নের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহস্য ভেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ যাচ্‌ঞা করিয়াছে। আজ অভীষ্টসিদ্ধির অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরী ডোবে, পাছে সামান্য একটা ভুলে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্ন্যাসী পূর্বে আসিয়া সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এখন যে তাহার কী কর্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল, সে হয়তো তাহার ঐশ্বর্যভাণ্ডারের ঠিক উপরেই বসিয়া আছে, অথচ কিছুই জানিতে পাইতেছে না।

বসিয়া বসিয়া সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল; সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল; ঝিল্লির ধ্বনিতে বনভূমি মুখর হইয়া উঠিল।

৫

এমন সময় কিছুদূর ঘন বনের মধ্যে অগ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, আর সেই শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

বহু কষ্টে কিছুদূর গিয়া একটা অশত্থ গাছের গুঁড়ির অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার সেই পরিচিত সন্ন্যাসী অগ্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে একমনে অঙ্ক কষিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের সেই পৈত্রিক তুলটের লিখন! আরে ভণ্ড, চোর! এইজন্যই সে মৃত্যুঞ্জয়কে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সন্ন্যাসী একবার করিয়া অঙ্ক কষিতেছে, আর, একটা মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে। কিয়দ্দূর মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পুনর্বার আসিয়া অঙ্ক কষিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এমনি করিয়া রাত্রি যখন অবসানপ্রায়, যখন নিশান্তের শীতবায়ুতে বনস্পতির অগ্রশাখার পল্লবগুলি মর্মরিত হইয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী সেই লিখনপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, সন্ন্যাসীর সাহায্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্য ভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। লুব্ধ সন্ন্যাসী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহায্য করিবে না, তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি রাখা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু, দিনের বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না; অতএব অন্তত কাল সকালে একবার গ্রামে যাওয়া আবশ্যক।

ভোরের দিকে অন্ধকার একটু ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে সন্ন্যাসী ছাইয়ের মধ্যে আঁক কষিতেছিল সেখানে ভালো করিয়া দেখিল, কিছুই বুঝিল না। চতুর্দিকে ঘুরিয়া দেখিল, অন্য বনখণ্ডের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নাই।

বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন মৃত্যুঞ্জয় অতি সাবধানে চারিদিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশে চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়।

যে দোকানে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিকটে একটি কায়স্থগৃহিণী ব্রত-উদ্‌যাপন করিয়া সেদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেইখানে আজ মৃত্যুঞ্জয়ের আহার জুটিয়া গেল। কয়দিন আহারের কষ্টের পর আজ তাহার ভোজনটি গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই গুরুভোজনের পর যেমন তামাকটি খাইয়া দোকানের মাদুরটিতে একবার গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিল অমনি গত রাত্রির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুঞ্জয় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় স্থির করিয়াছিল, আজ সকাল-সকাল আহারাদি করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উল্‌টা হইল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। তবু মৃত্যুঞ্জয় দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইয়া আসিল। গাছের ছায়ার মধ্যে দৃষ্টি আর চলে না, জঙ্গলের মধ্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় যে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। রাত্রি যখন অবসান হইল তখন দেখিল সমস্ত রাত্রি সে বনের প্রান্তে একই জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

কাকের দল কা-কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জয়ের কানে ব্যঙ্গপূর্ণ ধিক্কার বাক্যের মতো শুনাইল।

৬

গণনায় বারংবার ভুল আর সেই ভুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যাসী সুড়ঙ্গের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুড়ঙ্গের মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাঁৎলা পড়িয়াছে—মাঝে-মাঝে এক-এক জায়গায় জল চুঁইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগুলা ভেক গায়ে গায়ে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছুদূর যাইতেই সন্ন্যাসী দেখিলেন, সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবরুদ্ধ। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্বত্র লৌহদণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন, কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে না, কোথাও রন্ধ্র নাই, এই পথটার যে এইখানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খুলিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিয়া গেল।

পরদিন পুনর্বার গণনা সারিয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সেদিন গুপ্তসংকেত অনুসরণপূর্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোনোমতেই ভুল হইবে না।"

পথ অত্যন্ত জটিল; তাহার শাখা প্রশাখার অন্ত নাই—কোথাও এত সংকীর্ণ যে গুঁড়ি মারিয়া যাইতে হয়। বহু যত্নে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী একটা গোলাকার ঘরের মতো জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ইঁদারা। মশালের আলোকে সন্ন্যাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ইঁদারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সন্ন্যাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃঙ্খলটাকে অল্প একটুখানি নাড়াইবামাত্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ইঁদারার গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাইয়াছি।"

যেমন বলা অমনি সেই ঘরের ভাঙা ভিত্তি হইতে একটা পাথর গড়াইয়া পড়িল, আর সেই সঙ্গে আর-একটি কী সচেতন পদার্থ ধপ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া উঠিতেই তাঁহার হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিবিয়া গেল।

৭

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে।" কোনো উত্তর পাইলেন না। তখন অন্ধকারে হাতড়াইতে গিয়া তাঁহার হাতে একটি মানুষের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি।"

কোনো উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গেছে।

তখন চক্‌মকি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটাও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল, আর উঠিবার চেষ্টা করিয়া বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এ কী, মৃত্যুঞ্জয় যে! তোমার এ মতি হইল কেন।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "বাবা, মাপ করো। ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়া সামলাইতে পারি নাই—পিছলে পাথরসুদ্ধ আমি পড়িয়া গেছি। পা'টা নিশ্চয় ভাঙিয়া গেছে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমাকে মারিয়া তোমার কী লাভ হইত।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি কিসের লোভে আমার পূজাঘর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই সুড়ঙ্গের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ! তুমি চোর, তুমি ভণ্ড! আমার পিতামহকে যে সন্ন্যাসী ঐ লিখনখানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সংকেত বুঝিতে পারিবে। এই গুপ্ত ঐশ্বর্য আমাদেরই বংশের প্রাপ্য। তাই আমি এ কয়দিন না-খাইয়া না-ঘুমাইয়া ছায়ার মতো তোমার পশ্চাতে ফিরিয়াছি। আজ যখন তুমি বলিয়া উঠিলে 'পাইয়াছি' তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিয়া ঐ গর্তটার ভিতরে লুকাইয়া বসিয়াছিলাম। ওখান হইতে একটা পাথর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম, কিন্তু শরীর দুর্বল, জায়গাটাও অত্যন্ত পিছল— তাই পড়িয়া গেছি—এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেলো সেও ভালো—আমি যক্ষ হইয়া এই ধন আগলাইব—কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না—কোনোমতেই না। যদি লইতে চেষ্টা করো, আমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্ত-তুল্য হইবে—এ ধন তুমি কোনোদিন সুখে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা-পিতামহ এই ধনের উপর সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন—এই ধনের ধ্যান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইয়াছি—এই ধনের সন্ধানে আমি বাড়িতে অনাথা স্ত্রী ও শিশুসন্তান ফেলিয়া আহারনিদ্রা ছাড়িয়া লক্ষ্মীছাড়া পাগলের মতো মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—এ ধন তুমি আমার চোখের সম্মুখে কখনো লইতে পারিবে না।"

৮

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, তবে শোনো। সমস্ত কথা তোমাকে বলি। তুমি জানো তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তার নাম ছিল শংকর।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "হাঁ, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি সেই শংকর।"

মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ এই গুপ্ত ধনের উপর তাহার যে একমাত্র দাবি সে সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল, তাহারই বংশের আত্মীয় আসিয়া সে দাবি নষ্ট করিয়া দিল।

শংকর কহিলেন, 'দাদা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়া অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যতই গোপন করিতে লাগিলেন আমার ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নিচে বাক্সের মধ্যে ঐ লিখনখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার সন্ধান পাইলাম, আর দ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেইদিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশুসন্তান ছিল। আজ তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

"কত দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীদত্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনো সন্ন্যাসী আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া অনেক সন্ন্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আমার ঐ কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মুহূর্তের জন্যও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না।

"অবশেষে পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের বলে কুমায়ুন পর্বতে বাবা স্বরূপানন্দ স্বামীর সঙ্গ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, 'বাবা, তৃষ্ণা দূর করো, তাহা হইলেই বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে।'

"তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্বতের শিলাতলে শীতের সায়াহ্নে পরমহংস-বাবার ধুনিতে আগুন জ্বলিতেছিল—সেই আগুনে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষৎ একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই, আজ বুঝিয়াছি। তিনি নিশ্চয় মনে-মনে বলিয়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ, কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাৎ হয় না।

"কাগজখানার যখন কোনো চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারিদিক হইতে একটা নাগপাশ-বন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল। মুক্তির অপূর্ব আনন্দে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম, এখন হইতে আমার আর-কোনো ভয় নাই—আমি জগতে কিছুই চাহি না।

"ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস-বাবার সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলাম। তাঁহাকে অনেক খুঁজিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

"আমি তখন সন্ন্যাসী হইয়া নিরাসক্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বৎসর কাটিয়া গেল—সেই লিখনের কথা প্রায় ভুলিয়াই গেলাম।

"এমন সময় একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। দুই-একদিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্বপরিচিত।

"এক কালে বহুদিন যাহার সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম তাহার যে নাগাল পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, 'এখানে আর থাকা হইবে না, এ বন ছাড়িয়া চলিলাম।'

"কিন্তু ছাড়িয়া যাওয়া ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক-না, কী আছে—কৌতূহল একেবারে নিবৃত্ত করিয়া যাওয়াই ভালো। চিহ্নগুলা লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম; কোনো ফল হইল না। বার বার মনে হইতে লাগিল, কেন সে কাগজখানা পুড়াইয়া ফেলিলাম—সেখানা রাখিলেই বা ক্ষতি কী ছিল।

"তখন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধনরত্নে কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরিবরা তো গৃহী, সেই গুপ্ত সম্পদ ইহাদের জন্য উদ্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

"সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না।

"তাহার পরে একটি বৎসর ধরিয়া কাগজখানা লইয়া এই নির্জন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সন্ধান করিয়াছি। মনে আর-কোনো চিন্তা ছিল না। যত বারংবার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরো বাড়িয়া চলিল—উন্মত্তের মতো অহোরাত্র এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

"ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনোই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পরিতে না; কিন্তু আমি তন্ময় হইয়া ছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

"তাহার পরে, যাহা খুঁজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে পৃথিবীতে কোনো রাজরাজেশ্বরের ভাণ্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সংকেত ভেদ করিলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

"এই সংকেতটিই সর্বাপেক্ষা দুরূহ। কিন্তু এই সংকেতও আমি মনে-মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজন্যই 'পাইয়াছি' বলিয়া মনের উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিক্যের ভাণ্ডারের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।"

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি সন্ন্যাসী, তোমার তো

ধনের কোনো প্রয়োজন নাই—আমাকে সেই ভাণ্ডারের মধ্যে লইয়া যাও। আমাকে বঞ্চিত করিয়ো না।"

শংকর কহিলেন, "আজ আমার শেষ বন্ধন মুক্ত হইয়াছে। তুমি ঐ যে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিয়াছে। তৃষ্ণার করালমূর্তি আজ আমি দেখিলাম। আমার গুরু পরমহংসদেবের নিগূঢ় প্রশান্ত হাস্য এত দিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্বাণ আলোকশিখা জ্বালাইয়া তুলিল।"

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা ধরিয়া পুনরায় কাতর স্বরে কহিল, "তুমি মুক্ত পুরুষ, আমি মুক্ত নহি, আমি মুক্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, তবে তুমি তোমার এই লিখনটি লও। যদি ধন খুঁজিয়া লইতে পারো তবে লইয়ো।"

এই বলিয়া তাঁহার যষ্টি ও লিখনপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমাকে দয়া করো, আমাকে ফেলিয়া যাইয়ো না—আমাকে দেখাইয়া দাও।"

কোনো উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুঞ্জয় যষ্টির উপর ভর করিয়া হাতড়াইয়া সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু, পথ অত্যন্ত জটিল, গোলকধাঁধার মতো, বার বার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাত্রি কি দিন কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনো উপায় ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিড়া খুলিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর-একবার হাতড়াইয়া সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। নানা স্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'ওগো সন্ন্যাসী, তুমি কোথায়।"

তাহার সেই ডাক সুড়ঙ্গের সমস্ত শাখা প্রশাখা হইতে বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতি দূর হইতে উত্তর আসিল, "আমি তোমার নিকটেই আছি– কী চাও বলো।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল, "কোথায় ধন আছে আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দাও।"

তখন আর-কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বারংবার ডাকিল, কোনো সাড়া পাইল না।

দণ্ড প্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রি মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর-একবার

ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো, আছ কি।"

নিকট হইতেই উত্তর পাইল, "এইখানেই আছি। কী চাও।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি আর-কিছু চাই না—আমাকে এই সুড়ঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ধন চাও না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, চাহি না।"

তখন চক্‌মকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে এসো মৃত্যুঞ্জয়, এই সুড়ঙ্গ হইতে বাহিরে যাই।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল, "বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত ব্যর্থ হইবে। এত কষ্টের পরেও ধন কি পাইব না।"

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "কি নিষ্ঠুর।" বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনো পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনো অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। আলোক আকাশ আর বিশ্বচ্ছবির বৈচিত্র্যের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কহিল, "ওগো সন্ন্যাসী, ওগো নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উদ্ধার করো।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "ধন চাও না? তবে আমার হাত ধরো। আমার সঙ্গে চলো।"

এবারে আর আলো জ্বলিল না। এক হাতে যষ্টি ও এক হাতে সন্ন্যাসীর উত্তরীয় ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া-ফিরিয়া এক জায়গায় আসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "দাঁড়াও।"

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচাপড়া লোহার দ্বার খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "এসো।"

মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চক্‌মকি ঠোকার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন মশাল জ্বলিয়া উঠিল তখন এ কী আশ্চর্য দৃশ্য! চারি দিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরুদ্ধ কঠিন সূর্যালোকপুঞ্জের মতো স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিয়া উঠিল, "এ সোনা আমার—এ আমি কোনোমতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, ফেলিয়া যাইয়ো না; এই মশাল রহিল—আর এই ছাতু চিঁড়া আর বড়ো এক-ঘটি জল রাখিয়া গেলাম।"

দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন, আর এই স্বর্ণভাণ্ডারের লৌহদ্বারে কপাট পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় বার বার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোটো ছোটো স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর-একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারি দিকে সোনা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল, পৃথিবীর উপরে হয়তো এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে, সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে—তাহাদের বাড়িতে পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধ গন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাতিহাঁসগুলি দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকালবেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঊর্ধ্বোত্থিত দক্ষিণ হস্তের উপর একরাশি পিতল-কাঁসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয় দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ওগো সন্ন্যাসীঠাকুর, আছ কি।"

দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "কী চাও।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি বাহিরে যাইতে চাই—কিন্তু সঙ্গে এই সোনার দুটো-একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া নূতন মশাল জ্বালাইলেন—পূর্ণ কমণ্ডলু একটি রাখিলেন, আর উত্তরীয় হইতে কয়েক মুষ্টি চিঁড়া মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় পাতলা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোমড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগুলোকে লইয়া ঘরের চারি দিকে লোষ্ট্রখণ্ডের মতো ছড়াইতে লাগিল। কখনো বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনো বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারংবার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে-মনে বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে এমন সম্রাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে। মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চূর্ণ করিয়া ধূলির মতো সে ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিয়া উড়াইয়া ফেলে—আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত সুবর্ণলুব্ধ রাজা-মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে।

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগুলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া

শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারিদিকে সেই সোনার স্তূপ দেখিতে লাগিল। সে তখন দ্বারে আঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো সন্ন্যাসী, আমি এ সোনা চাই না—সোনা চাই না!"

কিন্তু দ্বার খুলিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু দ্বার খুলিল না। এক-একটা সোনার পিণ্ড লইয়া দ্বারের উপর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল, কোনো ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের বুক দমিয়া গেল—তবে আর কি সন্ন্যাসী আসিবে না! এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শুকাইয়া মরিতে হইবে!

তখন সোনাগুলাকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাস্যের মতো ঐ সোনার স্তূপ চারিদিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে—তাহার মধ্যে স্পন্দন নাই, পরিবর্তন নাই—মৃত্যুঞ্জয়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিণ্ডগুলা আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। ইহারা এই চির-অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া, কঠিন হইয়া, স্থির হইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পরে কুটিরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

গ্রামের ঘরের অতি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই যে ভোলা কুকুরটা লেজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত, সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কয়দিন সে যে-মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া, দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া, ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়িমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, মুদি কী সুখেই আছে। আজ কী বার কে জানে। যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ি ফিরিতেছে, সঙ্গচ্যুত সাথীকে উর্ধ্বস্বরে ডাক পড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়ানৌকায় পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া, পল্লীর শুষ্কবংশপত্রখচিত অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া চাষি-লোক হাতে দুটো-একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশ-ভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শতস্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ,

সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্মূল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, 'কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামা জননী ধরিত্রীর ধূলিক্রোড়ে, সেই উন্মুক্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে, সেই তৃণপত্রের গন্ধ-বাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটিমাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।'

এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, কী চাও।"

সে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুড়ঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না যাইব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তবু আমি এখানে এক মুহূর্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে এসো।"

মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর কূপের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন, "এখানি লইয়া তুমি কী করিবে।"

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

কার্তিক ১৩১১

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি; লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপ্‌ছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ; তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে — এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্‌খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল,

তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন।' বাস্তবিক, শিশুর মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তিসম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত — আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্নে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই — মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন, ফু।"

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধদৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারিদিন হইল, রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে, সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না—তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "দেখো, দেখো ও—ই দেখো পাখি, ওই উড়ে—এ গেল। আয় রে পাখি; আয় আয়।" এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা—বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট্ করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ববৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ঐ-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশু-প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল — একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল — দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু — খোকাবাবু — লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার!"

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না। কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চার দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় "বাবু — খোকাবাবু আমার" বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্ করিয়া মাঠাকরুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, "জানি নে, মা।"

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে

একদল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন-কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, "তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে — তুই যত টাকা চাস তোকে দেব।" শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, "কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন-কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত; মনে হইত, দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্না—রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্না—যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—'তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল, প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্ করিয়া চলে, এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরুনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল — আশ্চর্য হইয়া

মনে মনে কহিল, 'আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।' তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না — রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরি জোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।'

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে-শুনে ভালো এবং দেখিতে-শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর-একটি দোষ ছিল—সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত; এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ঠিক বাপের মতো নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়— কিন্তু যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এদিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদাই খুঁতখুঁত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, "আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে যাইতেছি।" এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন — এমন সময় প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল, "জয় হোক, মা।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে।"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি রাইচরণ।"

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, "মাঠাকরুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।"

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না— রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, "প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি— "

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, "বলিস কী রে। কোথায় সে।"

"আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।"

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভূষা আকার প্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো প্রমাণ আছে?"

রাইচরণ কহিল, "এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।"

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, "কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।"

রাইচরণ করজোড়ে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল, "প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব।"

কর্ত্রী বলিলেন, "আহা, থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, "যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।"

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।"

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরো বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, "সে আমি নয়, প্রভু।"

"তবে কে।"

"আমার অদৃষ্ট।"

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

রাইচরণ বলিল, "পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই।"

ফেল্‌না যখন দেখিল, সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, "বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।"

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

অগ্রহায়ণ ১২৯৮

সম্পত্তি-সমর্পণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন কুণ্ড মহাক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল, "আমি এখনই চলিলাম।"

বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড কহিলেন, "বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে পরাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখ-না।"

যজ্ঞনাথের ঘরে যেরূপ অশনবসনের প্রথা তাহাতে খুব যে বেশি ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে। প্রাচীনকালের ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অসম্ভব অল্প খরচে জীবন নির্বাহ করিতেন; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত, বেশভূষা-আহার বিহারে তাঁহারও সেইরূপ অত্যুচ্চ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই; সে কতকটা আধুনিক সমাজের দোষে এবং কতকটা শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতকগুলি অন্যায় নিয়মের অনুরোধে।

ছেলে যতদিন অবিবাহিত ছিল সহিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে খাওয়া-পরা সম্বন্ধে বাপের অত্যন্ত বিশুদ্ধ আদর্শের সহিত ছেলের আদর্শের অনৈক্য হইতে লাগিল। দেখা গেল, ছেলের আদর্শ ক্রমশই আধ্যাত্মিকের চেয়ে বেশি আধিভৌতিকের দিকে যাইতেছে। শীতগ্রীষ্ম-ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর পার্থিব সমাজের অনুকরণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে পিতাপুত্রে প্রায় বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বৃন্দাবনের স্ত্রীর গুরুতর পীড়াকালে কবিরাজ বহুব্যয়সাধ্য এক ঔষধের ব্যবস্থা করাতে, যজ্ঞনাথ তাহাতেই কবিরাজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৃন্দাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল, তার পরে রাগারাগি করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া গালি দিল।

বাপ বলিলেন, "কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? দামী ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজাবাদশারা মরে কোন্ দুঃখে। যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধুম করিয়া মরিবে।"

বাস্তবিক, যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে এ কথায় অনেকটা সান্ত্বনা পাইত। তাহার মা, দিদিমা কেহই মরিবার সময় ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইরূপ সনাতন প্রথা। কিন্তু আধুনিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এ দেশে ইংরাজের নূতন সমাগম হইয়াছে, কিন্তু সে সময়েও তখনকার-সেকালের লোক তখনকার-

একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত।

যাহা হউক, তখনকার-নব্য বৃন্দাবন তখনকার-প্রাচীন যজ্ঞনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, "আমি চলিলাম।"

বাপ তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে অনুমতি করিয়া সর্বসমক্ষে কহিলেন, বৃন্দাবনকে যদি তিনি কখনো এক পয়সা দেন তবে তাহা গোরক্তপাতের সহিত গণ্য হইবে। বৃন্দাবনও সর্বসমক্ষে যজ্ঞনাথের ধনগ্রহণ মাতৃরক্তপাতের তুল্য পাতক বলিয়া স্বীকার করিল। ইহার পর পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

বহুকাল শান্তির পরে এইরূপ একটি ছোটোখাটো বিপ্লবে গ্রামের লোক বেশ একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশেষত যজ্ঞনাথের ছেলে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্ঞনাথের দুঃসহ পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, সামান্য একটা বউয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল একালেই সম্ভব।

বিশেষত তাহারা খুব একটা যুক্তি দেখাইল; বলিল, একটা বউ গেলে অনতিবিলম্বে আর-একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না। যুক্তি খুব পাকা সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, বৃন্দাবনের মতো ছেলে এ যুক্তি শুনিলে অনুতপ্ত না হইয়া বরং কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইত।

বৃন্দাবনের বিদায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বৃন্দাবন যাওয়াতে এক তো ব্যয়সংক্ষেপ হইল, তাহার উপরে যজ্ঞনাথের একটা মহা ভয় দূর হইল। বৃন্দাবন কখন তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারে, এই আশঙ্কা তাঁহার সর্বদাই ছিল। যে অত্যল্প আহার ছিল তাহার সহিত বিষের কল্পনা সর্বদাই লিপ্ত হইয়া থাকিত। বধূর মৃত্যুর পর এ আশঙ্কা কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল, এবং পুত্রের বিদায়ের পর অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ হইল।

কেবল একটা বেদনা মনে বাজিয়াছিল। যজ্ঞনাথের চারি-বৎসর-বয়স্ক নাতি গোকুলচন্দ্রকে বৃন্দাবন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। গোকুলের খাওয়া-পরার খরচ অপেক্ষাকৃত কম সুতরাং তাহার প্রতি যজ্ঞনাথের স্নেহ অনেকটা নিষ্কণ্টক ছিল। তথাপি বৃন্দাবন যখন তাহাকে নিতান্তই লইয়া গেল তখন অকৃত্রিম শোকের মধ্যেও যজ্ঞনাথের মনে মুহূর্তের জন্য একটা জমাখরচের হিসাব উদয় হইয়াছিল— উভয়ে চলিয়া গেলে মাসে কতটা খরচ কমে এবং বৎসরে কতটা দাঁড়ায়, এবং যে টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহা কত টাকার সুদ।

কিন্তু তবু শূন্য গৃহে গোকুলচন্দ্রের উপদ্রব না থাকাতে গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাথের এমনি মুশকিল হইয়াছে, পূজার সময়ে কেহ ব্যাঘাত করে না, খাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া খায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইয়া পালায় এমন উপযুক্ত লোক কেহ নাই। নিরুপদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল যেন মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে, বিশেষত বিছানার কাঁথায় তাঁহার নাতির কৃত ছিদ্র এবং বসিবার মাদুরে উক্ত শিল্পী-অঙ্কিত মসীচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আরো অশান্ত হইয়া উঠিত। সেই অমিতাচারী বালকটি দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবার ধুতি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া পিতামহের নিকট বিস্তর তিরস্কার সহ্য করিয়াছিল; এক্ষণে তাহার শয়নগৃহে সেই শতগ্রন্থিবিশিষ্ট মলিন পরিত্যক্ত চীরখণ্ড দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল; সেটি পলিতা-প্রস্তুত-করণ কিংবা অন্য কোনো গার্হস্থ্য ব্যবহারে না লাগাইয়া যত্নপূর্বক সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি গোকুল ফিরিয়া আসে এবং এমন-কি, বৎসরে একখানি করিয়া ধুতিও নষ্ট করে তথাপি তাহাকে তিরস্কার করিবেন না।

কিন্তু গোকুল ফিরিল না এবং যজ্ঞনাথের বয়স যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল এবং শূন্য গৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।

যজ্ঞনাথ আর ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। এমন-কি, মধ্যাহ্নে যখন সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাসুখ লাভ করে যজ্ঞনাথ হুঁকা-হস্তে পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার এই নীরব মধ্যাহ্নভ্রমণের সময় পথের ছেলেরা খেলা পরিত্যাগপূর্বক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়া তাঁহার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে স্থানীয় কবি-রচিত বিবিধ ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। পাছে আহারের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাঁহার পিতৃদত্ত নাম উচ্চারণ করিতে কেহ সাহস করিত না, এইজন্য সকলেই স্বেচ্ছামতে তাঁহার নূতন নামকরণ করিত। বুড়োরা তাঁহাকে 'যজ্ঞনাশ' বলিতেন, কিন্তু ছেলেরা কেন যে তাঁহাকে 'চামচিকে' বলিয়া ডাকিত তাহার স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁহার রক্তহীন শীর্ণ চর্মের সহিত উক্ত খেচরের কোনো প্রকার শরীরগত সাদৃশ্য ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন এইরূপে আম্রতরুচ্ছায়াশীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহ্নে বেড়াইতেছিলেন; দেখিলেন, একজন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সর্দার হইয়া উঠিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন উপদ্রবের পন্থা নির্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেরা তাহার চরিত্রের বল এবং কল্পনার নূতনত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে তাহার বশ মানিয়াছে।

অন্য বালকেরা বৃদ্ধকে দেখিয়া যেরূপ খেলায় ভঙ্গ দিত, এ তাহা না করিয়া চট্‌ করিয়া আসিয়া যজ্ঞনাথের গায়ের কাছে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বন্ধনমুক্ত গিরগিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গা বাহিয়া অরণ্যাভিমুখে পলায়ন করিল — আকস্মিক ত্রাসে বৃদ্ধের সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ছেলেদের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছুদূর যাইতে না যাইতে যজ্ঞনাথের স্কন্ধ হইতে হঠাৎ তাঁহার গামছা অদৃশ্য হইয়া অপরিচিত বালকটির মাথায়

পাগড়ির আকার ধারণ করিল।

এই অজ্ঞাত মাণবকের নিকট হইতে এইপ্রকার নূতন প্রণালীর শিষ্টাচার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞনাথ ভারি সন্তুষ্ট হইলেন। কোনো বালকের নিকট হইতে এরূপ অসংকোচ আত্মীয়তা তিনি বহুদিন পান নাই। বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া এবং নানামত আশ্বাস দিয়া যজ্ঞনাথ তাহাকে কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

সে বলিল, "নিতাই পাল।"

"বাড়ি কোথায়।"

"বলিব না।"

"বাপের নাম কী।"

"বলিব না।"

"কেন বলিবে না।"

"আমি বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছি।"

"কেন।"

"আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়।"

এরূপ ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিষ্ফল অপব্যয় এবং বাপের বিষয়-বুদ্ধিহীনতার পরিচয়, তাহা তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনাথের মনে উদয় হইল।

যজ্ঞনাথ বলিলেন, "আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিবে?"

বালকটি কোনো আপত্তি না করিয়া এমনই নিঃসংকোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল যেন সে একটা পথপ্রান্তবর্তী তরুতল।

কেবল তাহাই নয়, খাওয়া-পরা সম্বন্ধে এমনই অম্লানবদনে নিজের অভিপ্রায়মত আদেশ প্রচার করিতে লাগিল, যেন পূর্বাহ্ণেই তাহার পুরা দাম চুকাইয়া দিয়াছে। এবং ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর সহিত রীতিমতো ঝগড়া করিত। নিজের ছেলেকে পরাস্ত করা সহজ কিন্তু পরের ছেলের কাছে যজ্ঞনাথকে হার মানিতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যজ্ঞনাথের ঘরে নিতাই পালের এই অভাবনীয় সমাদর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য হইয়া গেল। বুঝিল, বৃদ্ধ আর বেশিদিন বাঁচিবে না এবং কোথাকার এই বিদেশী ছেলেটাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবে।

বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষা উপস্থিত হইল, এবং সকলেই তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে বুকের পাঁজরের মতো ঢাকিয়া বেড়াইত।

ছেলেটা মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। যজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইতেন, "ভাই, তোকে আমি আমার সমস্ত বিষয়-আশয় দিয়া যাইব।" বালকের বয়স অল্প কিন্তু এই আশ্বাসের মর্যাদা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিত।

তখন গ্রামের লোকেরা বালকের বাপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল, "আহা, বাপ-মার মনে না-জানি কত কষ্টই হইতেছে। ছেলেটাও তো পাপিষ্ঠ কম নয়।"

বলিয়া ছেলেটার উদ্দেশে অকথ্য উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশি ঝাঁজ যে, ন্যায়বুদ্ধির উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বার্থের গাত্রদাহ বেশি অনুভূত হইত।

বৃদ্ধ একদিন এক পথিকের কাছে শুনিতে পাইল, দামোদর পাল বলিয়া এক ব্যক্তি তাহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, অবশেষে এই গ্রামের অভিমুখেই আসিতেছে। নিতাই এই সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবী বিষয়-আশয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়নোদ্যত হইল।

যজ্ঞনাথ নিতাইকে বারংবার আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তোমাকে আমি এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে, কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। গ্রামের লোকেরাও না।"

বালকের ভারি কৌতূহল হইল; কহিল, "কোথায় দেখাইয়া দাও-না।"

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "এখন দেখাইতে গেলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। রাত্রে দেখাইব।"

নিতাই এই নূতন রহস্য-আবিষ্কারের আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাপ অকৃতকার্য হইয়া চলিয়া গেলেই বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা লুকোচুরি খেলিতে হইবে, এইরূপ মনে মনে সংকল্প করিল। কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। ভারি মজা। বাপ আসিয়া সমস্ত দেশ খুঁজিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইবে না, সেও খুব কৌতুক।

মধ্যাহ্নে যজ্ঞনাথ বালককে গৃহে রুদ্ধ করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলে নিতাই তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বলিল, "চলো।"

যজ্ঞনাথ বলিলেন, "এখনো রাত্রি হয় নাই।"

নিতাই আবার কহিল, "রাত্রি হইয়াছে দাদা, চলো।"

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "এখনো পাড়ার লোক ঘুমায় নাই।"

নিতাই মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়াই কহিল, "এখন ঘুমাইয়াছে, চলো।"

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। নিদ্রাতুর নিতাই বহু কষ্টে নিদ্রা সংবরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি দুই প্রহর হইলে যজ্ঞনাথ নিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিদ্রিত গ্রামের অন্ধকার পথে বাহির হইলেন। আর-কোনো

শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল, এবং সেই শব্দে নিকটে এবং দূরে যতগুলা কুকুর ছিল সকলে তারস্বরে যোগ দিল। মাঝে মাঝে নিশাচর পক্ষী পদশব্দে ত্রস্ত হইয়া ঝট্‌পট্‌ করিয়া বনের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল। নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিল।

অনেক মাঠ ভাঙিয়া অবশেষে এক জঙ্গলের মধ্যে এক দেবতাহীন ভাঙা মন্দিরে উভয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্নস্বরে কহিল, "এইখানে?"

যেরূপ মনে করিয়াছিল সেরূপ কিছুই নয়। ইহার মধ্যে তেমন রহস্য নাই। পিতৃগৃহ-ত্যাগের পর এমন পোড়ো মন্দিরে তাহাকে মাঝে মাঝে রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছে। স্থানটা যদিও লুকোচুরি খেলার পক্ষে মন্দ নয়, কিন্তু তবু এখান হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

যজ্ঞনাথ মন্দিরের মধ্য হইতে একখণ্ড পাথর উঠাইয়া ফেলিলেন। বালক দেখিল, নিম্নে একটা ঘরের মতো, এবং সেখানে প্রদীপ জ্বলিতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় এবং কৌতূহল হইল, সেইসঙ্গে ভয়ও করিতে লাগিল। একটি মই বাহিয়া যজ্ঞনাথ নামিয়া গেলেন, তাঁহার পশ্চাতে নিতাইও ভয়ে ভয়ে নামিল।

নীচে গিয়া দেখিল, চারি দিকে পিতলের কলস; মধ্যে একটি আসন এবং তাহার সম্মুখে সিঁদুর, চন্দন, ফুলের মালা, পূজার উপকরণ। বালক কৌতূহলনিবৃত্তি করিতে গিয়া দেখিল, ঘড়ায় কেবল টাকা এবং মোহর।

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "নিতাই, আমি বলিয়াছিলাম, আমার সমস্ত টাকা তোমাকে দিব। আমার অধিক কিছু নাই, সবে এই-কটিমাত্র ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি ইহার সমস্তই তোমার হাতে দিব।"

বালক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "সমস্তই? ইহার একটা টাকাও তুমি লইবে না?"

"যদি লই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়। কিন্তু, একটি কথা আছে। যদি কখনো আমার নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র কিংবা তাহার ছেলে কিংবা তাহার পৌত্র কিংবা তাহার প্রপৌত্র কিংবা তাহার বংশের কেহ আসে তবে তাহার কিংবা তাহাদের হাতে এই সমস্ত টাকা গনিয়া দিতে হইবে।"

বালক মনে করিল, যজ্ঞনাথ পাগল হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল, "আচ্ছা।"

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "তবে এই আসনে বইস।"

"কেন।"

"তোমার পূজা হইবে।"

"কেন।"

"এইরূপ নিয়ম।"

বালক আসনে বসিল। যজ্ঞনাথ তাহার কপালে চন্দন দিলেন, সিঁদুরের টিপ দিয়া

দিলেন, গলায় মালা দিলেন; সম্মুখে বসিয়া বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

দেবতা হইয়া বসিয়া মন্ত্র শুনিতে নিতাইয়ের ভয় করিতে লাগিল; ডাকিল, "দাদা!"

যজ্ঞনাথ কোনো উত্তর না করিয়া মন্ত্র পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে এক-একটি ঘড়া বহু কষ্টে টানিয়া বালকের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া উৎসর্গ করিলেন এবং প্রত্যেকবার বলাইয়া লইলেন "যুধিষ্ঠির কুণ্ডের পুত্র গদাধর কুণ্ড তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড তস্য পুত্র পরমানন্দ কুণ্ড তস্য পুত্র যজ্ঞনাথ কুণ্ড তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ড তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডকে কিংবা তাহার পুত্র অথবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রকে কিংবা তাহার বংশের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে এই সমস্ত টাকা গনিয়া দিব।"

এইরূপ বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে ছেলেটা হতবুদ্ধির মতো হইয়া আসিল। তাহার জিহ্বা ক্রমে জড়াইয়া আসিল। যখন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়া গেল তখন দীপের ধূম ও উভয়ের নিশ্বাসবায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। বালকের তালু শুষ্ক হইয়া গেল, হাত-পা জ্বালা করিতে লাগিল, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

প্রদীপ ম্লান হইয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বালক অনুভব করিল, যজ্ঞনাথ মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

ব্যাকুল হইয়া কহিল, "দাদা, কোথায় যাও?"

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "আমি চলিলাম। তুই এখানে থাক্ — তোকে আর কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু মনে রাখিস, যজ্ঞনাথের পৌত্র বৃন্দাবনের পুত্র গোকুলচন্দ্র।"

বলিয়া উপরে উঠিয়াই মই তুলিয়া লইলেন। বালক রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হইতে বহু কষ্টে বলিল, "দাদা, আমি বাবার কাছে যাব।"

যজ্ঞনাথ ছিদ্রমুখে পাথরচাপা দিলেন এবং কান পাতিয়া শুনিলেন নিতাই আর-একবার রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

তার পরে একটা পতনের শব্দ হইল, তার পরে আর কোনো শব্দ হইল না।

যজ্ঞনাথ এইরূপে যক্ষের হস্তে ধন সমর্পণ করিয়া সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর মাটিচাপা দিতে লাগিলেন। তাহার উপর ভাঙা মন্দিরের ইট বালি স্তূপাকার করিলেন। তাহার উপর ঘাসের চাপড়া বসাইলেন, বনের গুল্ম রোপণ করিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল কিন্তু কিছুতেই সে স্থান হইতে নড়িতে পারিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল, যেন অনেক দূর হইতে, পৃথিবীর অতলস্পর্শ হইতে, একটা ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। মনে হইল, যেন রাত্রির আকাশ সেই একমাত্র শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, পৃথিবীর সমস্ত নিদ্রিত লোক যেন সেই শব্দে শয্যার উপরে জাগিয়া উঠিয়া কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

বৃদ্ধ অস্থির হইয়া কেবলই মাটির উপরে মাটি চাপাইতেছে। যেন এমনি করিয়া কোনোমতে পৃথিবীর মুখ চাপা দিতে চাহে। ঐ কে ডাকে "বাবা"।

বৃদ্ধ মাটিতে আঘাত করিয়া বলে, "চুপ কর্। সবাই শুনিতে পাইবে।"

আবার কে ডাকে "বাবা"।

দেখিল রৌদ্র উঠিয়াছে। ভয়ে মন্দির ছাড়িয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল। সেখানেও কে ডাকিল, "বাবা।"

যজ্ঞনাথ সচকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন কহিল, "বাবা, সন্ধান পাইলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লুকাইয়া আছে। তাহাকে দাও।"

বৃদ্ধ চোখমুখ বিকৃত করিয়া বৃন্দাবনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "তোর ছেলে?"

বৃন্দাবন কহিল, "হাঁ, গোকুল — এখন তাহার নাম নিতাই পাল, আমার নাম দামোদর। কাছাকাছি সর্বত্রই তোমার খ্যাতি আছে, সেইজন্য আমরা লজ্জায় নাম পরিবর্তন করিয়াছি; নহিলে কেহ আমাদের নাম উচ্চারণ করিত না।"

বৃদ্ধ দশ অঙ্গুলি দ্বারা আকাশ হাতড়াইতে হাতড়াইতে যেন বাতাস আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

চেতনা লাভ করিয়া যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনকে মন্দিরে টানিয়া লইয়া গেলেন। কহিলেন, "কান্না শুনিতে পাইতেছ?"

বৃন্দাবন কহিল, "না।"

"কান পাতিয়া শোনো দেখি, 'বাবা' বলিয়া কেহ ডাকিতেছে?"

বৃন্দাবন কহিল, "না।"

বৃদ্ধ তখন যেন ভারি নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর হইতে বৃদ্ধ সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, "কান্না শুনিতে পাইতেছ?" পাগলামির কথা শুনিয়া সকলেই হাসে।

অবশেষে বৎসর-চারেক পরে বৃদ্ধের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। যখন চোখের উপর হইতে জগতের আলো নিবিয়া আসিল এবং শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল তখন বিকারের বেগে সহসা উঠিয়া বসিল; একবার দুই হস্তে চারি দিক হাতড়াইয়া মুমূর্ষু কহিল, "নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে।"

সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে উঠিবার মই খুঁজিয়া না পাইয়া আবার সে ধুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের লুকোচুরি খেলায় যেখানে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেইখানে অন্তর্হিত হইল।

পৌষ ১২৯৮

নিশীথে

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল। এই অর্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু। ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্‌বিগ্নভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণবাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, "আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে —তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।"

আমি কিঞ্চিৎ সসংকোচে বলিলাম, "আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।"

দক্ষিণাচরণবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে, আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।"

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের-কাগজ-পাতা প্যাক্‌বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণবাবু বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া, জ্বরবিকার হইয়া, মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তার জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা

হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল; সে গব্য ঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছুর প্রতি দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আঃ করো কী। লোকে বলিবে কী। অমন করিয়া দিনরাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না।"

যেন নিজে পাখা খাইতেছি, এইরূপ ভান করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম তো ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। কোনোদিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা-উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, "পুরুষমানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নিচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না, এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল জুঁই গোলাপ গন্ধরাজ করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত, কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পান্সির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, "ঘরে বদ্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।"

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম, কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারি দিক শান্ত নিস্তব্ধ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে এক পার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটা উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল; আমি বলিয়া উঠিলাম, "তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না।"

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল, এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, "কোনো কালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।"

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখনো আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমতো প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে-সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সেগুলোকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে-সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর-দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎস্নারাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে।

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ-উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, "একবার বায়ুপরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।" আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের

দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্ ভন্ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন--

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্ণ হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর-কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ করো।"

এটা যেন কেবল একটা সুযুক্তি এবং সদ্‌বিবেচনার কথা--ইহার মধ্যে যে ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু, আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম, 'যতদিন এই দেহে জীবন আছে—'

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "নাও নাও ! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না !"

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম, "এ জীবনে আর কাহাকেও ভালোবাসিতে পারিব না।"

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনো স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই আরোগ্য-আশা-হীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ, চিরজীবন এই চিররুগ্ণকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম-যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তাক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মতো অতি সহজে বুঝিতেন; সেইজন্য যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন এ কথা মনে

করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু, বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম—মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন আমি হারান ডাক্তারের বাড়ি গিযাছি, কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো; কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু, মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারানবাবুকে বলিতেছেন, "ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।"

ডাক্তার বলিলেন, "ছি, এমন কথা বলিবেন না।"

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড়ো আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।"

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক।

এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণবাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আমাকে এক গ্লাস জল আনিয়া দাও।" জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাক্তারবাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্যদিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম; সেদিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিংবা হয়তো বড়ো কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক-একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে।"—তাঁহার সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই-তিনবার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ও কে। ও কে গো।"

আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, "আমি চিনি না।" বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্তেই বলিলাম, "ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা।"

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, "আপনি আসুন।" আমাকে বলিলেন, "আলোটা ধরো।"

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ

চলিতে লাগিল এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "এই নীল শিশিটা মালিস করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ।"

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, "বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইঁহাকে সেবা করিবে কে।"

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরানো ঝি আছে, সে আমাকে মায়ের মতো যত্ন করে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।"

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, ইনি এই বদ্ধ ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইঁহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?"

ডাক্তারবাবু আমাকে কহিলেন, "আসুন-না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।"

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তারবাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সেদিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে।"

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম।

ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিস করিলে হয় না?"

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন, সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন?"

আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন, "হাঁ।"

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প আনিতে ছুটিলেন।

আমি অর্ধমূর্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারংবার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।"

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

দক্ষিণাচরণ আর-একবার জল খাইয়া বলিলেন, "উঃ, বড়ো গরম!" বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন জাদু করিয়া তাঁহাব নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল; কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোন্‌খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব।

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘনছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরো ঘনীভূত; যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুর বর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিল-অঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য

আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়ি-পরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনো কালে ভুলিতে পারিব না।"

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর-একদিন আর-কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্তেই বকুলগাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নিচে দিয়া, গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া নিচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন।"

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, "শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?"

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ একঝাঁক পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও?

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখির ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তরদেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারি দিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড়ো সুখে ছিলাম। চারিদিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার অনেকদিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খ'ড়ে ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশনির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে

এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূরে চলিয়া গেলাম। সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল, তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রলোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুইজনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্‌বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যায়। এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিতভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মতো হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাঁধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কী ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীর স্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, "ও কে। ও কে। ও কে।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠাৎ এত রাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুইজনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে

বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটিমাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কে। ও কে। ও কে গো।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্তেই ছায়ামূর্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটি হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে; ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল; ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল; এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো।" আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।" সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।"

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, "একটু জল খান।"

এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ্ দপ্ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সেজন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, "ডাক্তার! ডাক্তার!"

মাঘ ১৩০১

ক্ষুধিত পাষাণ

আমি এবং আমার আত্মীয় পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়। তাহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাহার কথাবার্তা শুনিয়া আরো ধাঁধা লাগিয়া যায়. পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন-সকল অশ্রুতপূর্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতেছিল, রুশিয়ানরা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন-সকল গোপন মতলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ-সমস্ত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নবপরিচিত আলাপীটি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন : There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোকটির রকম-সকম দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষে কখনো বিজ্ঞান বলে, কখনো বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনো পার্সির বয়েত আওড়াইতে থাকে; বিজ্ঞান বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনোরূপ অধিকার না থাকাতে তাহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন-কি, আমার থিয়সফিস্ট্ আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীর সহিত কোনো-এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু-একটা যোগ আছে—কোনো একটা অপূর্ব ম্যাগনেটিজ্‌ম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা-কিছু। তিনি এই অসামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তিবিহ্বল মুগ্ধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন। আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং কিছু খুশি হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে সমবেত হইলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা-কী ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শুনিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিম্নলিখিত গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না।

রাজ্যচালনা সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম-সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অল্পবয়স্ক ও মজবুত লোক দেখিয়া প্রথমে বরীচে তুলার মাশুল-আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল।

বরীচ জায়গাটি বড়ো রমণীয়। নির্জন পাহাড়ের নিচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত স্বচ্ছতোয়ার অপভ্রংশ) উপলমুখরিত পথে নিপুণা নর্তকীর মতো পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড় শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেত প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে। নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধি জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া, কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া, সেতার কোলে, দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই, সাদা পাথরের উপর শুভ্র চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না—এখন ইহা আমাদের মতো নির্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুল-কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান। কিন্তু আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ইচ্ছা হয় দিনের বেলা থাকিবেন, কিন্তু কখনো এখানে রাত্রিযাপন করিবেন না।" আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা বলিল, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, "তথাস্তু।" এ বাড়ির এমন বদনাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ংকর ভারের মতো চাপিয়া থাকিত, আমি যতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া, অবিশ্রাম কাজকর্ম করিয়া, রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সপ্তাহখানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব নেশা আমাকে ক্রমশ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানোও শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মতো আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদার্পণমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল—কিন্তু আমি যেদিন সচেতনভাবে প্রথম ইহার সূত্রপাত অনুভব করি সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরামকেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তা নদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; ওপারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্নের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর

জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী পুদিনা ও মৌরীর জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

সূর্য যখন গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল, তৎক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালায় একটা দীর্ঘ ছায়াযবনিকা পড়িয়া গেল—এখানে পর্বতের ব্যবধান থাকাতে সূর্যাস্তের সময় আলো-আঁধারের সম্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম—কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বসিতেই, একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল— যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোনো মূর্তি ছিল না তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শতধারার মতো সকৌতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে এবং সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মতো আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে একপ্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভয়ের কি আনন্দের কি কৌতূহলের ঠিক বলিতে পারি না। বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল, ভালো করিয়া দেখি, কিন্তু সম্মুখে দেখিবার মতো কিছুই ছিল না; মনে হইল, ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট শোনা যাইবে—কিন্তু একান্তমনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মনে হইল, আড়াই শত বৎসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে, ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি—সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গুমোট ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বলো আর সত্যই বলো, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে-এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ

হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড়ো আশঙ্কা হইল যে, হঠাৎ বুঝি নির্জন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন। আমি বেচারা তুলার মাশুল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্বনাশিনী এইবার বুঝি আমার মুণ্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম, ভালো করিয়া আহার করিতে হইবে; শূন্য উদরেই সকল প্রকার দুরারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার পাচকটিকে ডাকিয়া প্রচুরঘৃতপক্ব মসলা-সুগন্ধি রীতিমতো মোগলাই খানা হুকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দমনে সাহেবের মতো সোলা-টুপি পরিয়া, নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া, গড় গড় শব্দে আপন তদন্ত কার্যে চলিয়া গেলাম। সেদিন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট লিখিবার দিন থাকাতে বিলম্বে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। মনে হইল সকলে বসিয়া আছে। রিপোর্ট অসমাপ্ত রাখিয়া সোলার টুপি মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জন পথ রথচক্রশব্দে সচকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবর্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

সিঁড়ির উপরে সম্মুখের ঘরটি অতি বৃহৎ। তিন সারি বড়ো বড়ো থামের উপর কারুকার্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাণ্ড ঘরটি আপনার বিপুলশূন্যতাভরে অহর্নিশি গম্ গম্ করিতে থাকে। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখনও প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল, ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল— যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারিদিকের দরজা জানলা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্ দিকে পলাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম—ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কী সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্কণ, কখনো বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক-দোলকগুলির ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান,

বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য, আর-সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি—অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চার শো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আপিস করিতে যাই, এ-সমস্তই আমার কাছে এমন অদ্ভুত হাস্যকর অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে, আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনই আমার মুসলমান ভৃত্য প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প্ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে, আমি অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমুকনাথ বটে; ইহাও মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোনো মায়া-সেতারে, অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি ও কবিবরেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্য যে, আমি বরীচের হাটে তুলার মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চার শো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্বক্ষণের অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসিন-প্রদীপ্ত ক্যাম্প্‌টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খাইয়া একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মুখবর্তী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেষ্টিত অরালী পর্বতের ঊর্ধ্বদেশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সহস্র কোটি যোজন দূর আকাশ হইতে সেই অতিতুচ্ছ ক্যাম্প্‌খাটের উপর শ্রীযুক্ত মাশুল কালেক্টরকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল—ইহাতে আমি বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম—ঘরে যে কোনো শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোনো যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকারসংকুচিত ম্লানভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোনো লোককেই দেখিলাম না। তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল, কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোনো কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

আমি অত্যন্ত চুপি চুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোষ্ঠময়, প্রকাণ্ডশূন্যতাময় নিদ্রিত ধ্বনি এবং সজাগ প্রতিধ্বনি-ময় বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না, তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুদ্ধ থাকিত এবং সে-সকল ঘরে আমি কখনো যাই নাই।

সে রাত্রে নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সংযতনিশ্বাসে সেই অদৃশ্য আহ্বানরূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়ে কোথায় যাইতেছিলাম, আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সংকীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই তথাপি তাহার মূর্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেতপ্রস্তররচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে; টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগ্‌দাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোনো-এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দার সম্মুখে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভয়ে আমার বক্ষের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের সাজ-পরা একটি ভীষণ কাফ্রিখোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া, দুই পা ছড়াইয়া দিয়া, বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পর্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না—কেবল জাফ্‌রান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চটি-পরা দুইখানি সুন্দর চরণ গোলাপি মখমল-আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেঝের এক পার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিকপাত্রে কতকগুলি আপেল, নাশপাতি, নারাঙ্গি এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোটো পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটি অপূর্ব ধূপের একপ্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম্র আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিতবক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম, অমনি সে চমকিয়া উঠিল —তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেঝেয় শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্পখাটের উপরে ঘর্মাক্তকলেবরে বসিয়া আছি—ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচাঁদ জাগরণক্লিষ্ট রোগীর মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেছে—এবং আমাদের পাগলা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা অনুসারে প্রত্যুষের জনশূন্য পথে "তফাত যাও" "তফাত যাও" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইরূপে আমার আরব্য উপন্যাসের এক রাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল—কিন্তু এখনো এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাত্রির ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্তক্লান্তদেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম—আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্মবদ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতি খাটো কোর্তা এবং আঁট প্যান্টলুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া– ঢিলা পায়জামা, ফুল-কাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া, রঙিন রুমালে আতর মাখিয়া বহু যত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহুকুণ্ডলায়িত বৃহৎ আলবোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড়ো কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোনো এক অপূর্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কী যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতকগুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘূর্ণমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বপ্নের আবর্তের মধ্যে, এই ক্বচিৎ হেনার গন্ধ, ক্বচিৎ সেতারের শব্দ, ক্বচিৎ সুরভিজলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মতো চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারই জাফরান রঙের পায়জামা, এবং দুটি শুভ্ররক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটি পরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচুলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লাল টুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাত্রে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথসংকুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় বড়ো আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্বক শাহজাদার মতো সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইতাম, আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরানীর ছায়া আসিয়া পড়িল—পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষু-তারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুত বেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া— মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটি উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত; আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া বেশগৃহের প্রান্তবর্তী শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম—আমার চারিদিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই অরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভরমণীয় সুকোমল ওড়না বারংবার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদকবেষ্টনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহ্নে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম—কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না—কিন্তু সেদিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা দুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় শুস্তা নদীর বালি এবং অরালী পর্বতের শুষ্ক পল্লবরাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পর্দায় পর্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্যালোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সেদিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পরদিন হইতে সেই কৌতুকাবহ খাটো কোর্তা এবং সাহেবি হ্যাট পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেইদিন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে— যেন আমার খাটের নিচে, মেঝের নিচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, 'তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও —কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের

উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার করো।'

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব। আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব। তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন্ বেদুইন দস্যু, বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো, মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গনিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কী ইতিহাস। সেই সারঙ্গীর সংগীত, নূপুরের নিক্বণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার। দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে। শাহেনশা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে; বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাবশি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্চর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে!

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগলা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে; চাপরাসি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেইদিনই আমার জিনিসপত্র তুলিয়া আপিসঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম—মনে হইতে লাগিল, এখনই কোথায় যাইবার আছে—তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামতও আমার কাছে বেশি-কিছু বোধ হইল না—যাহা-কিছু বর্তমান, যাহা-কিছু আমার চারিদিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন অর্থহীন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্‌টম্ চড়িয়া

ছুটিলাম ; দেখিলাম, টম্‌টম্‌ ঠিক গোধূলিমুহূর্তে আপনিই সেই পাষাণ-প্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রুতপদে সিঁড়িগুলি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে। অনুতাপে আমার হৃদয় উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জনা চাহিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি শূন্যমনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যন্ত্র হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি; বলি, "হে বহ্নি, যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে, এবার তাকে মার্জনা করো, তাহার দুই পক্ষ দগ্ধ করিয়া দাও, ভস্মসাৎ করিয়া ফেলো।"

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল। সেদিন অরালী পর্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়াছিল। জল স্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল; এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত ঝড় শৃঙ্খলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড়ো বড়ো শূন্য ঘরগুলা সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিসঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম—একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ়বদ্ধমুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনো সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনো ফুলিয়া-ফুলিয়া ফাটিয়া-ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামে না, ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই; কাহাকে সান্ত্বনা করিব। এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার। এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে।

পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।"

দেখিলাম, ভোর হইয়াছে এবং মেহের আলি এই ঘোর দুর্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয়তো ওই মেহের আলিও আমার মতো এক সময় এই প্রাসাদে বাস

করিয়াছিল, এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলের নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেহের আলি, ক্যা ঝুঁট হ্যায় রে?"

সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিল, "তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া করিম খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, "ইহার অর্থ কী আমায় খুলিয়া বলো।"

বৃদ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্মার্থ এই : এক সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত—সেই-সকল চিত্তদাহে, সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার উদ্ধারের কি কোনো পথ নাই।"

বৃদ্ধ কহিল, "একটিমাত্র উপায় আছে, তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি—কিন্তু তৎপূর্বে ওই গুলবাগের একটি ইরানী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হৃদয়বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনো ঘটে নাই।"

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল, গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ্র? তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফার্স্ট ক্লাসে একজন সুপ্তোত্থিত ইংরাজ জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া স্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধুটিকে দেখিয়াই 'হ্যালো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেন্ড ক্লাসে উঠিলাম। বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম, লোকটা আমাদিগকে বোকার মতো দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল; গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষে আমার থিয়সফিস্ট্ আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মতো বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

শ্রাবণ ১৩০২

পুত্রযজ্ঞ

বৈদ্যনাথ গ্রামের মধ্যে বিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমানের সমস্ত কাজ করিতেন। যখন বিবাহ করিলেন তখন তিনি বর্তমান নববধূর অপেক্ষা ভাবী নবকুমারের মুখ স্পষ্টতররূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। শুভদৃষ্টির সময় এতটা দূরদৃষ্টি প্রায় দেখা যায় না। তিনি পাকা লোক ছিলেন, সেইজন্য প্রেমের চেয়ে পিণ্ডটাকেই অধিক বুঝিতেন এবং পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা এই মর্মেই তিনি বিনোদিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সংসারে বিজ্ঞলোকও ঠকে। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াও যখন বিনোদিনী তাহার সর্বপ্রধান কর্তব্যটি পালন করিল না তখন পুন্নাম নরকের দ্বার খোলা দেখিয়া বৈদ্যনাথ বড়ো চিন্তিত হইলেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্যই বা কে ভোগ করিবে এই ভাবনায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেই ঐশ্বর্য ভোগ করিতে একপ্রকার বিমুখ হইলেন। পূর্বেই বলিয়াছি বর্তমানের অপেক্ষা ভবিষ্যৎটাকেই তিনি সত্য বলিয়া জানিতেন।

কিন্তু যুবতী বিনোদিনীর নিকট হঠাৎ এতটা প্রাজ্ঞতা প্রত্যাশা করা যায় না। সে বেচারার দুর্মূল্য বর্তমান, তাহার নববিকশিত যৌবন, বিনা প্রেমে বিফলে অতিবাহিত হইয়া যায় এইটেই তাহার পক্ষে সবচেয়ে শোচনীয় ছিল। পারলৌকিক পিণ্ডের ক্ষুধাটা সে ইহলৌকিক চিত্তক্ষুধাদাহে একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছিল, মনুর পবিত্র বিধান এবং বৈদ্যনাথের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তাহার বুভুক্ষিত হৃদয়ের তিলমাত্র তৃপ্তি হইল না।

যে যাহাই বলুক এই বয়সটাতে ভালোবাসা দেওয়া এবং ভালোবাসা পাওয়াই রমণীর সকল সুখ এবং সকল কর্তব্যের চেয়ে স্বভাবতই বেশি মনে হয়।

কিন্তু বিনোদার ভাগ্যে নবপ্রেমের বর্ষাবারিসিঞ্চনের বদলে স্বামীর, পিস্‌শাশুড়ির এবং অন্যান্য গুরু ও গুরুতর লোকের সমুচ্চ আকাশ হইতে তর্জন-গর্জনের শিলাবৃষ্টি ব্যবস্থা হইল। সকলেই তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া অপরাধী করিত। একটা ফুলের চারাকে আলোক এবং বাতাস হইতে রুদ্ধঘরে রাখিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, বিনোদার বঞ্চিত যৌবনেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

সদাসর্বদা এই-সকল চাপাচুপি ও বকাবকির মধ্যে থাকিতে না পারিয়া যখন সে কুসুমের বাড়ি তাস খেলিতে যাইত সেই সময়টা তাহার বড়ো ভালো লাগিত। সেখানে পুৎনরকের ভীষণ ছায়া সর্বদা বর্তমান না থাকাতে হাসি-ঠাট্টা গল্পের কোনো বাধা ছিল না।

কুসুম যেদিন তাস খেলিবার সাথি না পাইত সেদিন তাহার তরুণ দেবর

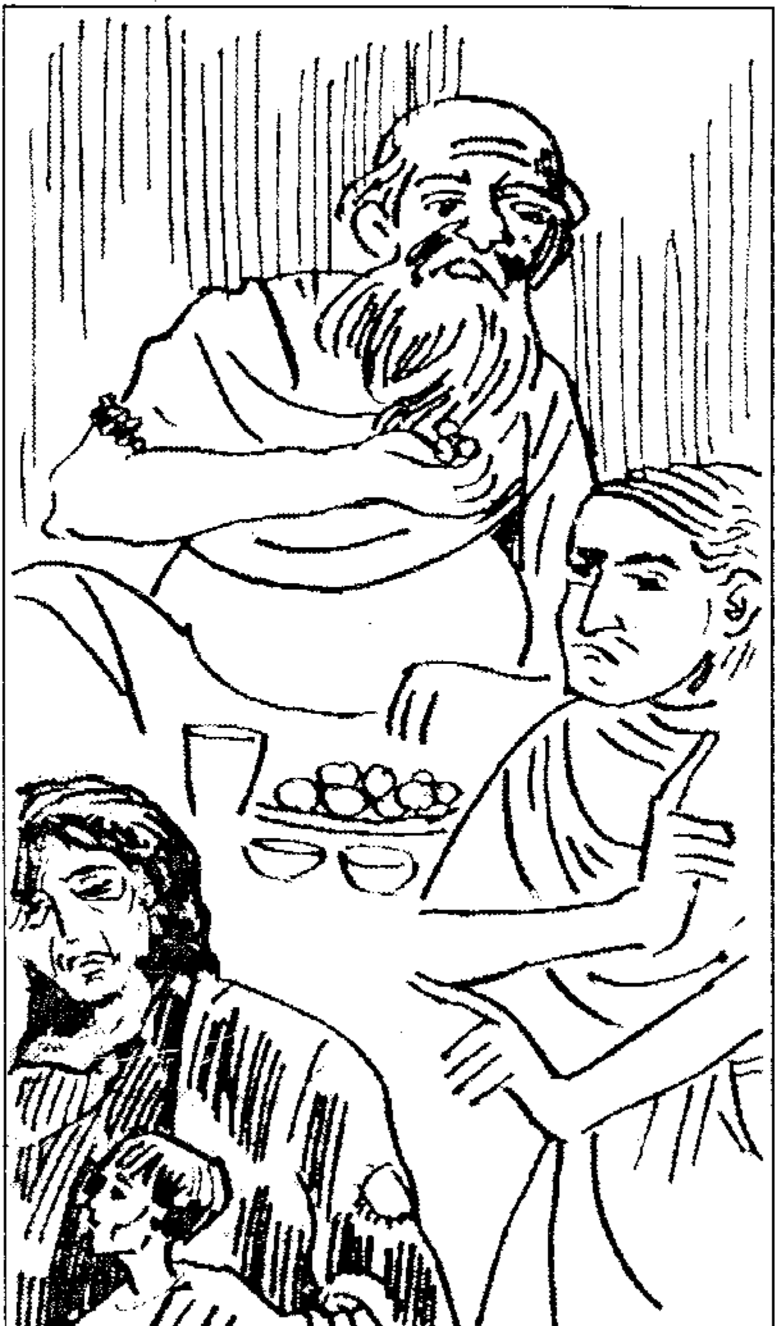

নগেন্দ্রকে ধরিয়া আনিত। নগেন্দ্রও বিনোদার আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এ সংসারে এক হইতে আর হয় এবং খেলা ক্রমে সংকটে পরিণত হইতে পারে এ-সব গুরুতর কথা অল্পবয়সে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না।

এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রেরও আপত্তির দৃঢ়তা কিছুমাত্র দেখা গেল না, এখন আর সে তাস খেলিবার জন্য অধিক পীড়াপীড়ির অপেক্ষা করিতে পারে না।

এইরূপে বিনোদার সহিত নগেন্দ্রের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হইতে লাগিল।

নগেন্দ্র যখন তাস খেলিতে বসিত তখন তাসের অপেক্ষা সজীবতর পদার্থের প্রতি তাহার নয়নমন পড়িয়া থাকাতে খেলায় প্রায়ই হারিতে লাগিল। পরাজয়ের প্রকৃত কারণ বুঝিতে কুসুম এবং বিনোদার কাহারও বাকি রহিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, কর্মফলের গুরুত্ব বোঝা অল্প বয়সের কর্ম নহে। কুসুম মনে করিত এ একটা বেশ মজা হইতেছে, এবং মজাটা ক্রমে ষোলো-আনায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠে ইহাতে তাহার একটা আগ্রহ ছিল। ভালোবাসার নবাঙ্কুরে গোপনে জলসিঞ্চন তরুণীদের পক্ষে বড়ো কৌতুকের।

বিনোদারও মন্দ লাগিল না। হৃদয়জয়ের সুতীক্ষ্ণ ক্ষমতাটা একজন পুরুষমানুষের উপর শাণিত করিবার ইচ্ছা অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

এইরূপে তাসের হারজিৎ ও ছক্কাপাঞ্জার পুনঃ পুনঃ আবর্তনের মধ্যে কোন্ এক সময়ে দুইটি খেলোয়াড়ের মনে মনে মিল হইয়া গেল, অন্তর্যামী ব্যতীত আর একজন খেলোয়াড় তাহা দেখিল এবং আমোদ বোধ করিল।

একদিন দুপুরবেলায় বিনোদা, কুসুম ও নগেন্দ্র তাস খেলিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে কুসুম তাহার রুগ্ণ শিশুর কান্না শুনিয়া উঠিয়া গেল। নগেন্দ্র বিনোদার সহিত গল্প করিতে লাগিল। কিন্তু কী গল্প করিতেছিল তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না; রক্তস্রোত তাহার হৃৎপিণ্ড উদ্‌বেলিত করিয়া তাহার সর্বশরীরের শিরার মধ্যে তরঙ্গিত হইতেছিল।

হঠাৎ একসময় তাহার উদ্দাম যৌবন বিনয়ের সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া ফেলিল, হঠাৎ বিনোদার হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া সবলে তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। বিনোদা নগেন্দ্র কর্তৃক এই অবমাননায় ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায় অধীর হইয়া নিজের হাত ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতেছে এমন সময় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। নগেন্দ্র নতমুখে ঘর হইতে বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

পরিচারিকা গম্ভীরস্বরে কহিল, "বৌঠাকরুন, তোমাকে পিসিমা ডাকছেন।" বিনোদা ছলছল চক্ষে নগেন্দ্রের প্রতি বিদ্যুৎকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া দাসীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

পরিচারিকা যেটুকু দেখিয়াছিল তাহাকে হ্রস্ব এবং যাহা না দেখিয়াছিল তাহাকেই

সুদীর্ঘতর করিয়া বৈদ্যনাথের অন্তঃপুরে একটা ঝড় তুলিয়া দিল। বিনোদার কী দশা হইল সে বর্ণনার অপেক্ষা কল্পনা সহজ। সে যে কতদূর নিরপরাধ কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিল না, নতমুখে সমস্ত সহিয়া গেল।

বৈদ্যনাথ আপন ভাবী পিণ্ডদাতার আবির্ভাব-সম্ভাবনা অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন জ্ঞান করিয়া বিনোদাকে কহিল, "কলঙ্কিনী, তুই আমার ঘর হইতে দূর হইয়া যা।"

বিনোদা শয়নকক্ষের দ্বার রোধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, তাহার অশ্রুহীন চক্ষু মধ্যাহ্নের মরুভূমির মতো জ্বলিতেছিল। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া বাহিরের বাগানে কাকের ডাক থামিয়া গেল, তখন নক্ষত্রখচিত শান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার বাপমায়ের কথা মনে পড়িল এবং তখন দুই গণ্ড দিয়া অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

সেই রাত্রে বিনোদা স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কেহ তাহার খোঁজও করিল না।

তখন বিনোদা জানিত না যে, 'প্রজনার্থং মহাভাগা' স্ত্রী-জন্মের মহাভাগ্য সে লাভ করিয়াছে, তাহার স্বামীর পারলৌকিক সদ্‌গতি তাহার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এই ঘটনার পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথের বৈষয়িক অবস্থার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। এখন তিনি পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় বৃহৎ বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছেন।

কিন্তু তাঁহার বিষয় যতই বৃদ্ধি হইল বিষয়ের উত্তরাধিকারীর জন্য প্রাণ ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরে পরে দুইবার বিবাহ করিলেন, তাহাতে পুত্র না জন্মিয়া কেবলই কলহ জন্মিতে লাগিল। দৈবজ্ঞপণ্ডিতে সন্ন্যাসী-অবধূতে ঘর ভরিয়া গেল; শিকড় মাদুলি জলপড়া এবং পেটেন্ট্ ঔষধের বর্ষণ হইতে লাগিল। কালীঘাটে যত ছাগশিশু মরিল তাহার অস্থিস্তূপে তৈমুরলঙ্গের কঙ্কালজয়স্তম্ভ ধিক্কৃত হইতে পারিত; কিন্তু তবু, কেবল গুটিকতক অস্থি ও অতি স্বল্প মাংসের একটি ক্ষুদ্রতম শিশুও বৈদ্যনাথের বিশাল প্রাসাদের প্রান্তস্থান অধিকার করিয়া দেখা দিল না। তাঁহার অবর্তমানে পরের ছেলে কে তাঁহার অন্ন খাইবে ইহাই ভাবিয়া অন্নে তাঁহার অরুচি জন্মিল।

বৈদ্যনাথ আরো একটি স্ত্রী বিবাহ করিলেন—কারণ, সংসারে আশারও অন্ত নাই, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যারও শেষ নাই।

দৈবজ্ঞেরা কোষ্ঠী দেখিয়া বলিল, ঐ কন্যার পুত্রস্থানে যেরূপ শুভযোগ দেখা যাইতেছে তাহাতে বৈদ্যনাথের ঘরে প্রজাবৃদ্ধির আর বিলম্ব নাই; তাহার পরে ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেল তথাপি পুত্রস্থানের শুভযোগ আলস্য পরিত্যাগ করিলেন না।

বৈদ্যনাথ নৈরাশ্যে অবনত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পরামর্শে একটা প্রচুরব্যয়সাধ্য যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। তাহাতে বহুকাল ধরিয়া বহু ব্রাহ্মণের সেবা চলিতে লাগিল।

এ দিকে তখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা অস্থিচর্মসার হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদ্যনাথ যখন অন্নের মধ্যে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, আমার অন্ন কে খাইবে, তখন সমস্ত উপবাসী দেশ আপন রিক্তস্থালীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, কী খাইব।

ঠিক সেই সময়ে চারিমাস কাল ধরিয়া বৈদ্যনাথের চতুর্থ সহধর্মিণী একশত ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিতেছিল এবং একশত ব্রাহ্মণ প্রাতে প্রচুর অন্ন এবং সায়াহ্নে অপর্যাপ্ত পরিমাণে জলপান খাইয়া খুরি সরা ভাঁড় এবং দধিঘৃতলিপ্ত কলার পাতে ম্যুনিসিপালিটির আবর্জনাশকট পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। অন্নের গন্ধে দুর্ভিক্ষকাতর বুভুক্ষুগণ দলে দলে দ্বারে সমাগত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে সর্বদা খেদাইয়া রাখিবার জন্য অতিরিক্ত দ্বারী নিযুক্ত হইল।

একদিন প্রাতে বৈদ্যনাথের মার্বল-মণ্ডিত দালানে একটি স্থূলোদর সন্ন্যাসী দুইসের মোহনভোগ এবং দেড়সের দুগ্ধ-সেবায় নিযুক্ত আছে, বৈদ্যনাথ গায়ে একখানি চাদর দিয়া জোড়করে একান্ত বিনীতভাবে ভূতলে বসিয়া ভক্তিভরে পবিত্র ভোজন ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় কোনোমতে দ্বারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া জীর্ণদেহ বালক-সহিত একটি অতি শীর্ণকায়া রমণী গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল, "বাবু, দুটি খেতে দাও।"

বৈদ্যনাথ শশব্যস্ত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "গুরুদয়াল! গুরুদয়াল!" গতিক মন্দ বুঝিয়া স্ত্রীলোকটি অতি করুণস্বরে কহিল, "ওগো, এই ছেলেটিকে দুটি খেতে দাও। আমি কিছু চাই নে।"

গুরুদয়াল আসিয়া বালক ও তাহার মাতাকে তাড়াইয়া দিল। সেই ক্ষুধাতুর নিরন্ন বালকটি বৈদ্যনাথের একমাত্র পুত্র। একশত পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ এবং তিনজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথকে পুত্রপ্রাপ্তির দুরাশায় প্রলুব্ধ করিয়া তাহার অন্ন খাইতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

মণিহারা

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপরে মাঝি নমাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায়, সোনার রঙ হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর-এক আভায় মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারান্দা-ঝুলিয়া-পড়া-জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্বমূল-বিদারিত ঘাটের উপরে ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শুষ্ক চক্ষুর কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সময় মাথা হইতে পা পর্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।"

দেখিলাম, ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাকরের যেমন একরকম বহুকালজীর্ণ সংস্কারবিহীন চেহারা, ইঁহারও সেইরূপ। ধুতির উপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম-খোলা চাপকান; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক সোপান পার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম, "আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি।"

"কী করা হয়।"

"ব্যবসা করিয়া থাকি।"

"কী ব্যবসা।"

"হরীতকী, রেশমের গুটি এবং কাঠের ব্যাবসা।"

"কী নাম।"

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম; কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে।

ভদ্রলোকের কৌতূহলনিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, "এখানে কী করিতে আগমন।"

আমি কহিলাম, "বায়ুপরিবর্তন।"

লোকটি কিছু আশ্চর্য হইল। কহিল, "মহাশয়, আজ প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি কিন্তু কিছু তো ফল পাই নাই।"

আমি কহিলাম, "এ কথা মানিতেই হইবে রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে।"

তিনি কহিলেন, "আজ্ঞা, হাঁ, যথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন।"

আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, "এই বাড়িতে।"

বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আজ পনেরো বৎসর পূর্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমাস্টার। তাঁহার ক্ষুধা ও রোগ-শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নিচে একজোড়া বড়োবড়ো চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতমূর্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাস্টার কহিলেন—

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কালেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমন-কি, ব্যামো হইলে অ্যাসিস্টান্ট্‌-সার্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-যে কুশ্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে; সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া

রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া থাকে তাহার স্ত্রী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসরের শান-দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাণ ও নাগপাশবন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।

স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে চায়, স্বামী যদি ভালোমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয় তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালোমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল—ব্যবসায়েও সে সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেইসঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত, দানই বুঝি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্টা বুঝিয়াছিল আর কি।

ইহার ফল হইল এই যে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ জোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত; যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্মানুরোধে এইখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তবু পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল। কিন্তু ফণিভূষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না; ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো, বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনো তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট

হয় না; কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চব্বিশ বৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চৌদ্দ বৎসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ তাহাকে এমন একটা-কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা বসন্তপ্রভাতের নবসূর্যের মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; গৃহের আশ্রয়স্বরূপে স্ত্রী যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশ ঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকন্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রী ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষমানুষের কর্ম! স্ত্রী আপনার কাজ করুক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইঙ্গিত, অণুপরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা—ভালোবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষমানুষকে দেন নাই, দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষমানুষের তিলপরিমাণ অনুরাগ-বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গীটুকু এবং ভঙ্গীর মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালোবাসাই মেয়েদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়

ঠিকমতো পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজন্যই বিধাতা ভালোবাসা-মান যন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রণাশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে-পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না, এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে; সুতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শুভবিবাহের পূর্বে পুরুষকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন! একলা পড়িয়া থাকি, স্ত্রীর নিকট হইতে নির্বাসিত; দূর হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়—এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোট কথাটা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি হইত না, তথাপি ফণিভূষণের হৃদয় কী-যেন-কী নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিণীর শূন্যগহ্বর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামুক্তার গহনাঢালিতে কিন্তু এগুলো পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে, হৃদয় শূন্য থাকিত। খুড়া দুর্গামোহন ভালোবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খুড়ির নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণেলাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহমাত্র করিবেন না।

ঠিক এই সময়ে শৃগালগুলা নিকটবর্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিটকয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেইঅন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায় ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হইক বা নবসভ্যতাদুর্বল ফণিভূষণের আচরণেই হউক, রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন—

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া

পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায়, তাহা হইলেই মুহূর্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যাবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্‌পট্‌ এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিত, যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে; যে ভালোবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না, যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুন্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যান্ড্‌নোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয়; কিন্তু সুর বাধিয়া যায়, বাক্যস্খলন হয়, এমন সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইয়াছে, তোমার গহনাগুলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দুর্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ-না কিছুই উত্তর করিল না তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালোবাসার একমাত্র অধিকার, সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই তাহার মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভর্ৎসনা করা যাইত তবে সম্ভবত সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট, ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে। পদে পদে এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষ মানুষকে এরূপ উদার, এরূপ প্রবল, এরূপ বৃহদাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কি বসিয়া বসিয়া

অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে. না, ইহা তাঁহাকে শোভা পায়?

যাহা হউক, আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অণুবীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতপটুত্ব যে-সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত, অত্যন্ত নব্য পুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রকমের! ইহারা মেয়েমানুষের মতোই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষমানুষের যে-কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ-বা বর্বর, কেহ-বা নির্বোধ, কেহ-বা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমত স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দূরসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত; তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছু কিছু সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন পরামর্শ কী।'

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল—অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, 'বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।'

মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল, এইরূপ হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সংগত। তাহার দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না, অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন, যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা রূপকমাত্র নহে, যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা মানিক, যাহা বক্ষের, যাহা কণ্ঠের, যাহা মাথার—সেই অনেক দিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্তেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, 'কী করা যায়।

মধুসূদন কহিল, 'গহনাগুলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চলো।' গহনার কিছু অংশ, এমন-কি অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাওরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যুষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও।' মণি কহিল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।'

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হুহু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোনো প্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পারিল না, মোটা চাদরের নিচে যে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই। মণিমালিকা ফণিভূষণকে বুঝিত না বটে কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে, সে কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হ্রস্ব-ইকারকে দীর্ঘ-ঈকার এবং দন্ত্য-স'কে তালব্য-শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে, এ কথাটা ঠিকমতই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক বুঝিল। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, আমি গুরুতর ক্ষতিসম্ভাবনা সত্ত্বেও স্ত্রীর অলংকার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তবু আমাকে সন্দেহ। আমাকে আজিও চিনিল না।

নিজের প্রতি যে নিদারুণ অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল মাত্র। পুরুষমানুষ বিধাতার ন্যায়দণ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে না পারে তবে ধিক্ তাহাকে। পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মতো রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রীলোক শ্রাবণমেঘের মতো অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে, বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেঁকে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, 'এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব।' আরো শতাব্দী-পাঁচছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবীযুগের ফণিভূষণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই

আদিযুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে, শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ংকরী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক-অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনো সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভীষণ দণ্ডবিধি।

দিন দশেক পরে কোনোমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য কৃতীপুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের দ্বারের কাছে আসিয়া উপনীত হইল।

দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্নমাত্র নাই। স্বামীর বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল! মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্য-ব্যবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসারপিঞ্জরে প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহরহ হৃদয়খনির রক্তমানিক ও অশ্রুজলের মুক্তামালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি। এই চিরজীবনের সর্বস্বজড়ানো শূন্য সংসার-খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতিদূরে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনোরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি ইচ্ছা হয় তো ফিরিয়া আসিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, 'চুপ করিয়া থাকিলে কী হইবে, কর্ত্রীবধূর খবর লওয়া চাই তো।' এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল, মণি অথবা মধু এ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই।

তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে-তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল। মধুর তল্লাস করিতে পুলিসে খবর দেওয়া হইল—কোন্ নৌকা, নৌকার মাঝি কে, কোন্ পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ-সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারায় বৃষ্টিপাতশব্দে যাত্রার গানের সুর মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ-যে বাতায়নের উপরে শিথিলকজা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়া ছিল—বাদলার হাওয়া, বৃষ্টির ছাট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্টস্টুডিয়ো-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর একজোড়া ছবি

টাঙানো; আলনার উপরে একটা গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্যোব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল, এসেন্সের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যান্টার, শৌখিন তাস, সমুদ্রের বড়ো বড়ো কড়ি, এমন-কি, শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো; যে অতিক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোটো শখের কেরোসিন-ল্যাম্প্ সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্প্‌টি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষমুহূর্তের নিরুত্তর সাক্ষী; সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন এত ইতিহাস, সমস্ত জড়সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহ স্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন, তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারিদিকের এই সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড়-সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো; এই-সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন এক সময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানলার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্‌ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে, তাহার মনে হইতেছিল যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে এই অতিকঠিন নিকষ-পাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।

এমন সময় একটা ঠক্‌ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্‌ঝম্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্রদৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রুতহস্তে আরো একটা বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে

লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দারোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধদ্বারের উপর ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রুদ্ধদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবদ্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নিচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং হৃৎপিণ্ড নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙিয়া দেখিল, বাহিরে আর কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনো ঝর্‌ঝর্ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যবৎ যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জলপতনশব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দারোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল, 'মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানা প্রকারের লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না।' ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, 'তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।' ফণিভূষণ কহিল, 'সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে।' দরোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো-একটি অনির্দিষ্ট আসন্নপ্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রার গানের চীৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অদ্ভুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেকরাত্রে এক সময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরো একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বুঝা গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্বদিনের মতো নদীর ঘাটে একটা ঠক্‌ঠক্ এবং ঝম্‌ঝম্ শব্দ উঠিল। কিন্তু ফণিভূষণ সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজের

মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল, কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্তদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল, অন্দরমহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোলসিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খট্‌খট্‌ এবং ঝম্‌ঝম্‌ থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে বিদ্যুদ্‌বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মণি!' অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চীৎকারে ঘরের শাসিগুলা পর্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ছেলেদের ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পরদিন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, সেদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কী সাধনে নিযুক্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্রগুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না। এবং উৎসব-জাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা ঊর্ধ্বমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কালেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদিঘির তৃণশয়নে চিৎ হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরল কক্ষে চোদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কী সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদগরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে; বলিতেছে, 'সংসারোহয়মতীববিচিত্রঃ!'

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে।

পূর্বরাত্রির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ দ্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরে গোলসিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল, এবং শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। অলংকারগুলি ঢিলা, ঢল্‌ঢল্ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব; সেই কালো তারা, সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দৃষ্টি। আজ আঠারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা-আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়ত সুন্দর কালো-কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল, দেখিয়া তাহার সর্বশরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলিসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল; হাড়েতে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মতো

তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোলসিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খট্‌খট্‌ ঠক্‌ঠক্‌ ঝম্‌ঝম্‌ করিতে করিতে নিচে উত্তীর্ণ হইল। নিচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল; অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইঁটের-খোয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগুলি অস্থিপাতে কড়্‌কড়্‌ করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলংকৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজুগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর তাহার পথপ্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাব দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন।"

তিনি কহিলেন, "না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতিঠাকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে।"

আমি কহিলাম, "দ্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।"

ইস্কুলমাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, "আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনার স্ত্রীর নাম কী ছিল।"

আমি কহিলাম, "নৃত্যকালী।"

অগ্রহায়ণ ১৩০৫

মাস্টারমশায়

ভূমিকা

রাত্রি তখন প্রায় দুটা। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দসমুদ্রে একটুখানি ঢেউ তুলিয়া একটা বড়ো জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের দিক হইতে আসিয়া বির্জিতলাও-এর মোড়ের কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকাগাড়ি দেখিয়া আরোহী বাবু তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাঁহার পাশে একটি কোট-হ্যাট পরা বাঙালি বিলাত-ফের্তা যুবা সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘুমাইতেছিল। এই যুবকটি নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহারই অভ্যর্থনা-উপলক্ষে বন্ধুমহলে একটা খানা হইয়া গেছে। সেই খানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধু তাহাকে কিছুদূর অগ্রসর করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দু-তিনবার ঠেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন, "মজুমদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি যাও।"

মজুমদার সচকিত হইয়া একটি বিলাতি দিব্য গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভালো করিয়া ঠিকানা বাৎলাইয়া দিয়া ব্রুহাম গাড়ির আরোহী নিজের গম্য পথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকাগাড়ি কিছুদূর সিধা গিয়া পার্ক-স্ট্রীটের সম্মুখে ময়দানের রাস্তায় মোড় লইল। মজুমদার আর-একবার ইংরেজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল, 'এ কী। এ তো আমার পথ নয়!' তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, 'হবেও বা, এইটিই হয়তো সোজা রাস্তা।'

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—কোনো লোক নাই তবু তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভর্তি হইয়া উঠিতেছে; যেন তাহার আসনের শূন্য অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠাসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাবিল, 'এ কী ব্যাপার। গাড়িটা আমার সঙ্গে এ কিরকম ব্যবহার শুরু করিল।'

"এই গাড়োয়ান, গাড়োয়ান!"

গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সহিসটার হাত চাপিয়া ধরিল; কহিল, "তুম্ ভিতর আকে বৈঠো।"

সহিস ভীতকণ্ঠে কহিল, "নেহি, সা'ব, ভিতর নেহি যায়ে গা!"

শুনিয়া মজুমদারের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল; সে জোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, "জল্‌দি ভিতর আও।"

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল। তখন মজুমদার পাশের

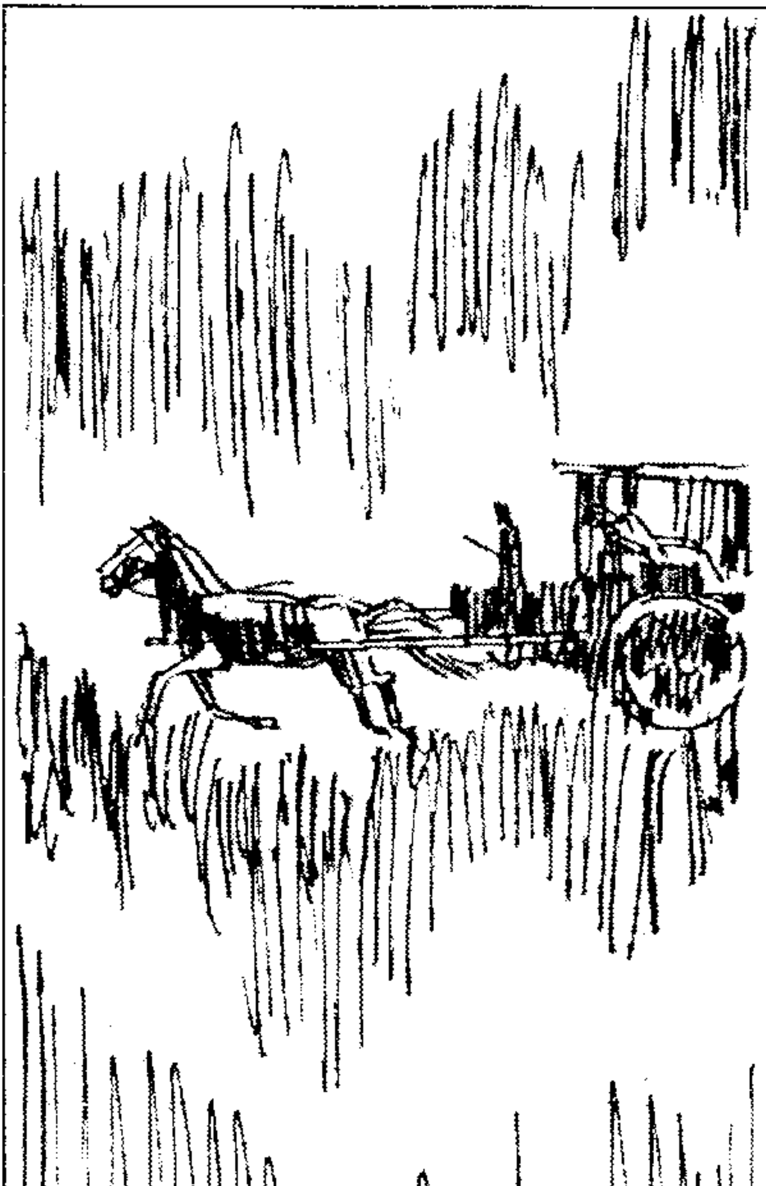

দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল; কিছুই দেখিতে পাইল না, তবু মনে হইল, পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া আছে। কোনোমতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজুমদার কহিল, "গাড়োয়ান, গাড়ি রোখো।" বোধ হইল, গাড়োয়ান যেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাতে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিল—ঘোড়া কোনোমতেই থামিল না। না থামিয়া ঘোড়াদুটা রেড রোডের রাস্তা ধরিয়া পুনর্বার দক্ষিণের দিকে মোড় লইল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আরে, কাঁহা যাতা।" কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শূন্যতার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনোমতে আড়ষ্ট হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদূর সংকীর্ণ করিতে হয়, তাহা সে করিল, কিন্তু সে যতটুকু জায়গা ছাড়িয়া ছিল ততটুকু জায়গা ভরিয়া উঠিল। মজুমদার মনে-মনে তর্ক করিতে লাগিল যে, 'কোন প্রাচীন য়ুরোপীয় জ্ঞানী বলিয়াছেন, Nature abhors vacuum তাই তো দেখিতেছি। কিন্তু এটা কী রে! এটা কি Nature? যদি আমাকে কিছু না বলে তবে আমি এখনই ইহাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া পড়ি।' লাফ দিতে সাহস হইল না—পাছে পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব একটা-কিছু ঘটে। 'পাহারাওয়ালা' বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু বহুকষ্টে এমনি একটুখানি অদ্ভুত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হইল যে, অত্যন্ত ভয়ের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মতো পরস্পর মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং গ্যাসের খুঁটিগুলো সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না, এমনিভাবে খাড়া হইয়া মিট্‌মিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল, চট করিয়া এক লম্ফে সামনের আসনে গিয়া বসিবে। যেমনি মনে করা অমনি অনুভব করিল সামনের আসন হইতে কেবলমাত্র একটা চাহনি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষু নাই, কিছুই নাই, অথচ একটা চাহনি। সে চাহনি যে কাহার তাহা যেন মনে পড়িতেছে অথচ কোনোমতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুমদার দুই চক্ষু জোর করিয়া বুজিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু ভয়ে বুজিতে পারিল না—সেই অনির্দেশ্য চাহনির দিকে দুই চোখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে, নিমেষ ফেলিতে সময় পাইল না।

এ দিকে গাড়িটা কেবলই ময়দানের রাস্তার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া দুটো ক্রমেই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল । তাহাদের বেগ কেবলই বাড়িয়া চলিল— গাড়ির খড়খড়েগুলো থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া ঝর্‌ঝর শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়িটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধাক্কা খাইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল, তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "সাহেব, কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

মজুমদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘুরাইলি কেন?"

গাড়োয়ান আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কই, ময়দানের মধ্যে তো ঘুরাই নাই।"

মজুমদার বিশ্বাস না করিয়া কহিল, "তবে এ কি শুধু স্বপ্ন।"

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়া ভীত হইয়া কহিল, "বাবুসাহেব, বুঝি শুধু স্বপ্ন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

মজুমদারের তখন নেশা ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্পে কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু, রাত্রে তাহার ভালো করিয়া ঘুম হইল না—কেবলই ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিটা কার।

১

অধর মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড়ো হৌসের মুৎসুদ্দিগিরি পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। অধরবাবু বাপের উপার্জিত নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন, তাহাকে আজ নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পাল্‌কিতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এ দিকে তাঁহার ক্রিয়াকর্ম দানধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে-আপদে অভাবে-অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত, ইহাই তিনি গর্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধরবাবু বড়ো বাড়ি ও গাড়ি-জুড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর তাঁহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার হুঁকায় বাঁধানো তামাক টানিয়া যায় এবং অ্যাটর্নি-আপিসের বাবুদের সঙ্গে স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারের খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি কষাকষি যে, পাড়ার ফুটবল ক্লাবের নাছোড়বান্দা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হল না, হল না, করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মার ধরনের। বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক, রঙ রজনীগন্ধার পাপড়ির মতো—যে দেখিল সেই বলিল, "আহা ছেলে তো নয়, যেন কার্তিক!" অধরবাবুর অনুচর রতিকান্ত বলিল, "বড়ো ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে।"

ছেলেটির নাম হইল বেণুগোপাল। ইতিপূর্বে অধরবাবুর স্ত্রী ননীবালা সংসারখরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মতো তেমন জোর করিয়া কোনোদিন খাটান নাই। দুটো-একটা শখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবশ্যক আয়োজন লইয়া মাঝে

মাঝে বচসা হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, বেণুগোপাল সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব এক-এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা রঙের সাজসজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা-কিছু দাবি উত্থাপিত করিলেন, সব-কটাই তিনি কখনো নীরব অশ্রুপাতে কখনো সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণুগোপালের জন্য, যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাই'ই চাই—সেখানে শূন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

২

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিয়া অনেক-পাস-করা এক বুড়ো মাস্টার রাখিলেন। এই মাস্টার বেণুকে মিষ্টভাষায় ও শিষ্টাচারে বশ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্যন্ত মাস্টারি মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার ভাষার মিষ্টতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলই বেসুর লাগিল—সেই শুষ্ক সাধনায় ছেলে ভুলিল না।

ননীবালা অধরলালকে কহিলেন, "ও তোমার কেমন মাস্টার। ওকে দেখিলেই যে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও।"

বুড়ো মাস্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বরা হইত তেমনি ননীবালার ছেলে স্বয়ম্মাস্টার হইতে বসিল—সে যাহাকে না বরিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বৃথা।

এমনি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাস্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলে এন্‌ট্রেন্স স্কুলে কোনোমতে এন্‌ট্রেন্স পাস করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্ন অংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের 'কন্যাকুমারী'র মতো সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মতো প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী চাও। কাহাকে চাও" হরলাল ভয়ে ভয়ে

বলিল, "বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।" দরোয়ান কহিল, "দেখা হইবে না।" তাহার উত্তরে হরলাল কী বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত করিতেছিল এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল, "বাবু, চলা যাও।"

বেণুর হঠাৎ জিদ্ চড়িল—সে কহিল, "নেহি যায় গা।" বলিয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালসভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপচাপ বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন হইয়া বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিলেন। সেদিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈবক্রমে হরলালের মাস্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পড়া কি পর্যন্ত।"

হরলাল একটুখানি মুখ নিচু করিয়া কহিল, "এন্‌ট্রেন্স্ পাস করিয়াছি।"

রতিকান্ত ভ্রূ তুলিয়া কহিল, "শুধু এন্‌ট্রেন্স্ পাস? আমি বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বয়সও তো নেহাত কম দেখি না।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কত এম. এ. বি. এ. আসিল ও গেল, কাহাকেও পছন্দ হইল না—আর শেষকালে কি সোনাবাবু এন্‌ট্রেন্স্-পাস-করা মাস্টারের কাছে পড়িবেন!"

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "যাও!" রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিও বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবাবু চাঁদবাবু বলিয়া খেপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারি সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে মনে-মনে ভাবিতেছিল, এইবার কোনো সুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিতান্ত সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্থির হইল, হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে, ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যেটুকু অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটুকু দয়া সার্থক হইতে পারিবে।

৩

এবারে মাস্টার টিঁকিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আত্মীয়বন্ধু কেহই ছিল না—এই সুন্দর ছোটো ছেলেটি তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোনো মানুষকে ভালোবাসিবার সুযোগ ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই। কী করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে, এই আশায় সে বহু কষ্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশুবয়স কেবল সংকোচেই কাটিয়াছে—নিষেধের গণ্ডি পার হইয়া দুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্যপ্রতাপকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনোদিন পায় নাই। সে কাহারও দলে ছিল না, সে আপনার ছেঁড়া বই ও ভাঙা স্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই নিস্তব্ধ ভালোমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনোদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দুঃখ পাইয়া কাঁদা, এ দুটোই যাহাকে অন্য লোকের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া যাইতে হয়, তাহার মতো করুণার পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মানুষের নিচে চাপা-পড়া হরলাল নিজেও জানিত না, তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়াছিল। বেণুর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর-একটা জিনিস আছে—সে যখন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর-কিছুই লাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে; একটি অতি ছোটো ও আর-একটি তিন বছরের বোন আছে—বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের যোগ্যই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই, কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড়ো ঘর বলিয়া নিজের মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার উপযুক্ত ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অনুকূল অবস্থায় বেণুর যে-সকল দৌরাত্ম্য দশ জনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে হইত। এই সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরো দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বলিতে লাগিল, "আমাদের সোনাবাবুকে মাস্টারমশায় মাটি করিতে বসিয়াছেন।" অধরলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হইতে তফাত করে এমন সাধ্য কাহার আছে।

৪

বেণুর বয়স এখন এগারো। হরলাল এফ. এ. পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি-একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে, কিন্তু ওই এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধুর সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলদিঘি এবং কোনো-কোনোদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, তাহাকে স্কট ও ভিক্টর হ্যুগোর গল্প একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত—উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্সপীয়ারের 'জুলিয়স্ সীজার' মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে অ্যান্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ওই একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়উদ্‌বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মতো হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া মুখস্থ করিত তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বুঝিবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগুণ বাড়িয়া যায়।

বেণু ইস্কুল হইতে আসিয়াই কোনোমতে তাড়াতাড়ি জলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতায় কোনো প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে এক দিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিল, "তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘণ্টা, বিকালে এক ঘণ্টা পড়াইবে—দিনরাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন। আজকাল ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে। আগে যে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না! বেণু আমার বড়ো ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্য।"

সেদিন রতিকান্ত অধরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল যে, তাহার জানা তিন-চার জন লোক, বড়োমানুষের ছেলের মাস্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্বেসর্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামত চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইশারা করিয়া যে এ-সকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের বুঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, আজ বেণুর মার কথা শুনিয়া তাহার বুক ভাঙিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, বড়োমানুষের ঘরে মাস্টারের পদবীটা কী। গোয়ালঘরে ছেলেকে

দুধ জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে—ছাত্রের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ-স্থাপন এতবড়ো একটা স্পর্ধা যে বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্যন্ত কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থসাধনের একটা চাতুরী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর-কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।"

সেদিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখ ভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল—সেদিন পড়া সুবিধামত হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাচ্ছায় মাছ ছিল। তাহাদিগকে মুড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলো পাথর সাজাইয়া, ছোটো ছোটো রাস্তা ও ছোটো গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিল্য ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোটো বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালীর কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানে চর্চা করা তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়াহ্নে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্য আজ বেণু যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সকালে ওঠায় সে আজ মাস্টারমশায়কে বুঝি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাস্টারমশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু বেদনা লইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল; সকালবেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল বিকাল হইতে তোর কী হইয়াছে বল্ দেখি। মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন—ভালো করিয়া খাইতেছিস না—ব্যাপারখানা কী।"

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর করিয়া যখন তাহাকে বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তখন সে আর থাকিতে পারিল না, ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মাস্টারমশায়—"

মা কহিলেন, "মাস্টারমশায় কী।"

বেণু বলিতে পারিল না মাস্টারমশায় কি করিয়াছেন। কী যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন, "মাস্টারমশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!"

সে কথার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বেণু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

৫

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলা কাপড়চোপড় চুরি হইয়া গেল। পুলিসকে খবর দেওয়া হইল। পুলিস খানাতল্লাসিতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রতিকান্ত নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, "যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে।"

মালের কোনো কিনারা হইল না। এরূপ লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ্য। তিনি পৃথিবীসুদ্ধ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, "বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন। যাহার যখন খুশি আসিতেছে যাইতেছে।"

অধরলাল মাস্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখো হরলাল, তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেণুকে ঠিক সময় মতো পড়াইয়া যাইবে, এই হইলেই ভালো হয়—নাহয় আমি তোমার দুই টাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।"

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল, "এ তো অতি ভালো কথা—উভয় পক্ষেই ভালো।"

হরলাল মুখ নিচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণুকে পড়ানো তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না, অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সেদিন বেণু ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায়ের ঘর শূন্য। তাঁহার সেই ভগ্নপ্রায় টিনের পেঁট্‌রাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা ঝুলিত, সে দড়িটা আছে কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত, তাহার বদলে সেখানে একটা বড়ো বোতলের মধ্যে সোনালি মাছ ঝক্‌ঝক্‌ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাস্টারমশায়ের হস্তাক্ষরে বেণুর নাম-লেখা একটা কাগজ আঁটা। আর-একটি নূতন ভালো বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই, তাহার ভিতরকার পাতায় এক প্রান্তে বেণুর নাম ও তাহার নিচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণু ছুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, "বাবা, মাস্টারমশায় কোথায় গেছেন?"

বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।"

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাবু ব্যাকুল হইয়া কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তক্তপোশের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখিল, প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণু ঘরে ঢুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আটকাইয়া গেল; কথা কহিতে গেলেই তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে, এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না।

বেণু কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।"

বেণু তাহাদের বৃদ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল, যেমন করিয়া হউক, মাস্টারমশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের পেঁট্‌রা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ ইস্কুলে যাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাহা সে বলিতেও পারিল না অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল 'আমাদের বাড়ি চলো', এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়াছে। কিন্তু ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল, বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা নিশাচর বাদুড়ের মতো আর ঝুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। খানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে লেক্‌চারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড়ো বড়ো ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে-সমস্ত আঁকজোক পড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ঈজিপ্টের চিত্রলিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল বুঝিল, এ সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি-বা পাস হয়, বৃত্তি

পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ও দিকে দেশে মাকেও দু-চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না-পাওয়া তাহার পক্ষে আরো কঠিন; এই জন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলালের সৌভাগ্যক্রমে একটি বড়ো ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারি করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড়ো সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল, তিনি মুখ দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দু-চার কথা কহিয়াই তিনি মনে-মনে বলিলেন, 'এ লোকটা চলিবে।' জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে?" হরলাল কহিল, "না।" "জামিন দিতে পারিবে?" তাহার উত্তরেও "না।" "কোনো বড়োলোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার?" কোনো বড়োলোককেই সে জানে না।

শুনিয়া সাহেব আরো যেন খুশি হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ করো, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে।" তার পরে সাহেব তাহার বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "পনেরো টাকা আগাম দিতেছি, আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈরি করাইয়া লইবে।"

কাপড় তৈরি হইল, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড়োসাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরানিরা বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক-একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাঁহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরানিরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটোখাটো গলির মধ্যে ছোটোখাটো বাড়িতে বাসা করিল। এত দিন পরে তাহার মার দুঃখ ঘুচিল। মা বলিলেন, "বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।"

হরলাল মাতার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, "মা, ওইটে মাপ করিতে হইবে।"

মাতার আর-একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিলেন, "তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণুগোপালের গল্প করিস, তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।"

হরলাল কহিল, "মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইবে। রোসো, একটা বড়ো বাসা করি, তাহার পরে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।"

৭

হরলালের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে ছোটো গলি হইতে বড়ো গলি ও ছোটো বাড়ি হইতে বড়ো বাড়িতে তাহার বাস-পরিবর্তন হইল। তবু সে কী জানি কী মনে করিয়া, অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতেই মন স্থির করিতে পারিল না।

হয়তো কোনোদিনই তাহার সংকোচ ঘুচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শুনিয়া মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেকদিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণুর অশৌচের সময় পার হইয়া গেল, তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু, ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড়ো হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী যোগে তাহার নূতন গোঁফের রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধুমহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাগি টেবিল কোথায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আসবাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোনো তাগিদ দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন দুই-একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজারদর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু, ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, "আমার বেণুকে সামান্য লোকের ছেলের মতো গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না— লোহার সিন্দুকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্।" ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে-মনে বুঝিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল যেদিন বেণু হঠাৎ সকালবেলায় তাহার সেই মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল 'মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।' সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাস্টারমশায়কে কেই বা ডাকিবে।

হরলাল মনে করিয়াছিল, এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল 'উহাকে আসিতে বলিব', তাহার পরে ভাবিল 'বলিয়া লাভ কি—বেণু হয়তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে, কিন্তু, থাক্।'

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন—"আহা, বাছার মা মারা গেছে!"

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, "অধরবাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি।"

বেণু কহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনো সেই খোকাবাবু আছি।"

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই কার্তিকের মতো ছেলেটিকে তাঁহার দুই স্নিগ্ধ চক্ষুর আশীর্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, 'আহা, এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল।'

আহার সারিয়াই বেণু কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাকে আজ একটু সকাল-সকাল যাইতে হইবে। আমার দুই-একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।"

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়িগাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মুহূর্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, "হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে-মনে কহিল, 'বাস্, এই পর্যন্ত। আর-কখনো ডাকিব না। একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাস্টারি করিয়াছিলাম বটে। কিন্তু, আমি সামান্য হরলাল মাত্র।'

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত, কিন্তু দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল এসেন্সের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে, মশায়।"

বেণু বলিয়া উঠল, "মাস্টারমশায়, আমি।"

হরলাল কহিল, "এ কী ব্যাপার। কখন আসিয়াছ।"

বেণু কহিল, "অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন, তাহা তো আমি জানিতাম না।"

বহুকাল হইল সেই-যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই, কহা নাই, আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার

সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুইজনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "সব ভালো তো? কিছু বিশেষ খবর আছে?"

বেণু কহিল, পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়োই একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে। কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ওই সেকেন্ড ইয়ারেই আটকা পড়িয়া থাকে! তাহার চেয়ে অনেক বয়সে ছোটো ছেলের সঙ্গে তাহাকে একসঙ্গে পড়িতে হয়, তাহার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কী ইচ্ছা।"

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, বারিস্টার হইয়া আসে। তাহারই সঙ্গে একসঙ্গে পড়িত, এমন-কি, তাহার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক কাঁচা, একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, "তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ?"

বেণু কহিল, "জানাইয়াছি। বাবা বলেন, পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে—এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।"

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু কহিল, "আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না।" বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

হরলাল কহিল, "চলো, আমি-সুদ্ধ তোমার বাবার কাছে যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা ভালো হয় স্থির করা যাইবে।"

বেণু কহিল, "না, আমি সেখানে যাইব না।"

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে, এ কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না। অথচ 'আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না' এ কথা বলাও বড়ো শক্ত।

হরলাল ভাবিল, 'আর-একটু বাদে মনটা একটু ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইবে।' জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণু কহিল, "না, আমার ক্ষুধা নাই, আমি আজ খাইব না।"

হরলাল কহিল, "সে কি হয়।" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, "মা, বেণু আসিয়াছে তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শুনিয়া মা ভারি খুশি হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইয়া বেণুর কাছে আসিয়া বসিল। একটুখানি কাশিয়া,

একটুখানি ইতস্তত করিয়া, সে বেণুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "বেণু, কাজটা ভালো হইতেছে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।"

শুনিয়া তখনই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয়, আমি সতীশের বাড়ি যাইব।"

বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "রোসো, কিছু খাইয়া যাও।"

বেণু রাগ করিয়া কহিল, "না, আমি খাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমন সময়, হরলালের জন্য যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্য থালায় গুছাইয়া মা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কোথায় যাও, বাছা!"

বেণু কহিল, "আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।"

মা কহিলেন, "সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না।" এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া খাইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়া কিছু খাইতেছে না, খাবার লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র, এমন সময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মচ্‌মচ্‌ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই বুঝি! রতিকান্ত আমাকে তখনই বলিয়াছিল, কিন্তু তোমার পেটে যে এত মতলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ, বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে! কিন্তু, সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিস-কেস করিব, তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।"

এই বলিয়া বেণুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চল্। ওঠ্।" বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সেদিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না।

৯

এবারে হরলালের সদাগর-আপিস কী জানি কী কারণে মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত-আট হাজার টাকা লইয়া মফস্বলে যাইতে হইত।

পাইকেরদিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহাদের যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত, সেখানে রসিদ ও খাতা দেখিয়া গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া বর্তমান সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুইজন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড়োসাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন—হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘ মাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে, চৈত্র পর্যন্ত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপ রাত্রে ফিরিয়া শুনিল বেণু আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া বসাইয়াছিলেন। সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরো স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরো দুই-একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "বাড়িতে মা নাই নাকি, সেইজন্য সেখানে তাহার মন টেঁকে না। আমি বেণুকে তোর ছোটো ভাইয়ের মতো আপন ছেলের মতোই দেখি। সেই স্নেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে।" এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। বেণু বলিল, "বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টিঁকিতে পারিতেছি না। বিশেষত শুনিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন—তাঁহার সঙ্গে কেবলই পরামর্শ চলিতেছে। পূর্বে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি আমি দুই-চারিদিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন—আমি স্বতন্ত্র হইতে চাই।"

স্নেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সংকটের সময় আর সকলকে ফেলিয়া বেণু যে তাহার সেই মাস্টারমশায়ের কাছে আসিয়াছে, ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাস্টারমশায়ের কতটুকুই বা সাধ্য আছে!

বেণু কহিল, "যেমন করিয়া হোক, বিলাতে গিয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই।"

হরলাল কহিল, "অধরবাবু কি যাইতে দিবেন।"

বেণু কহিল, "আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে যেরকম মায়া, বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।"

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "কী কৌশল।"

বেণু কহিল, "আমি হ্যান্ডনোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলাত যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

হরলাল কহিল, "তোমাকে টাকা ধার দিবে কে।"

বেণু কহিল, "আপনি পারেন না?"

হরলাল আশ্চর্য হইয়া কহিল, "আমি!" তাহার মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

বেণু কহিল, কেন, আপনার দরোয়ান তো তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।"

হরলাল হাসিয়া কহিল, "সে দরোয়ানও যেমন আমার, টাকাও তেমনি।"

বলিয়া এই আপিসের টাকার ব্যবহারটা কী তাহা বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি-রাত্রের জন্যই দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন করে।

বেণু কহিল, "আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না? নাহয় আমি সুদ বেশি করিয়া দিব।"

হরলাল কহিল, "তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয়তো দিতেও পারেন।"

বেণু কহিল, "বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন তো টাকা দিবেন না কেন।"

তর্কটা এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে-মনে ভাবিতে লাগিল, 'আমার যদি কিছু থাকিত, তবে বাড়িঘর জমিজমা সমস্ত বেচিয়া-কিনিয়া টাকা দিতাম।' কিন্তু একটিমাত্র অসুবিধা এই যে, বাড়িঘর জমিজমা কিছুই নাই।

১০

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগাড়ি দাঁড়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরে মেঝের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু নূতন ধরনের। শৌখিন ধুতিচাদরের বদলে নধর শরীরে পার্শি কোট ও প্যান্টলুন আঁটিয়া মাথায় ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দুই

হাতের আঙুলে মণিমুক্তার আংটি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট। কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীরার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার। এত রাত্রে এ বেশে যে!"

বেণু কহিল, "পরশু বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম, আমি কিছুদিনের জন্য আমাদের বারাকপুরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভারি খুশি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি। ইচ্ছা হইতেছে, আর ফিরিব না। যদি সাহস থাকিত তবে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতাম।"

বলিতে বলিতে বেণু কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের বুকে যেন ছুরি বিঁধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া বেণুর মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে, বেণুর স্নেহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর পক্ষে কিরকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে-মনে ভাবিল, পৃথিবীতে গরিব হইয়া না জন্মিলেও দুঃখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণুকে কী বলিয়া যে সান্ত্বনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণুর হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল, এমন একটা বেদনার সময় বেণু কী করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণু যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল, "এই আংটিগুলি আমার মায়ের।"

শুনিয়া হরলাল বহু কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "বেণু, খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণু কহিল, "হাঁ—আপনার খাওয়া হয় নাই?"

হরলাল কহিল, "টাকাগুলি গুনিয়া আয়রন-চেস্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।"

বেণু কহিল, "আপনি খাইয়া আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম; মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছে।"

হরলাল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "আমি চট্‌ করিয়া খাইয়া আসিতেছি।"

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণুর চিবুকের স্পর্শ লইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণুর অভাব তিনি পূরণ করিতে পারিবেন না, এই তাঁহার দুঃখ।

চারিদিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেণুর ছেলেবেলাকার গল্প

হইতে লাগিল। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযতস্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ একসময় ঘড়ি খুলিয়া বেণু কহিল, "আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।"

হরলালের মা কহিলেন, "বাবা, আজ রাত্রে এইখানেই থাকো-না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে একসঙ্গেই বাহির হইবে।"

বেণু মিনতি করিয়া কহিল, "না, মা, এ অনুরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই হইবে।"

হরলালকে কহিল, "মাস্টারমশায়, এই আংটি-ঘড়িগুলা বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন, আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যান্ডব্যাগটা আনিয়া দিক। সেইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া দিই।"

আপিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়া আসিল। বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনই আয়রন-সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণু হরলালের মার পায়ের ধুলা লইল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন, "মা জগদম্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।"

তাহার পরে বেণু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর-কোনো দিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লণ্ঠনে আলো জ্বলিল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণুকে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টাকা গনিতে গনিতে ভাগ করিয়া এক-একটা থলিতে ভরতি করিতে লাগিল। নোটগুলা পূর্বেই গনা হইয়া থলিবন্দি হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

১১

লোহার সিন্দুকের চাবি মাথার বালিশের নিচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শয়ন করিল। ভালো ঘুম হইল না। স্বপ্নে দেখিল—বেণুর মা পর্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছেন; কথা কিছুই স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনি-পান্না-হীরার অলংকার হইতে লাল সবুজ শুভ্র রশ্মির সূচিগুলি কালো পর্দাটাকে ফুঁড়িয়া বাহির

হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাণপণে বেণুকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কী একটা ভাঙিয়া পর্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল— চমকিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তূপাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জানলায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জ্বালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া মফস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে কহিলেন, "কী বাবা, উঠিয়াছিস?"

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গলমুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে-মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস। ভোরের স্বপন কি মিথ্যা হইবে!"

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগুলা লোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া প্যাকবাক্সয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল —দুই-তিনটা নোটের থলি শূন্য! মনে হইল স্বপন দেখিতেছে। থলেগুলা লইয়া সিন্দুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল—তাহাতে শূন্য থলের শূন্যতা অপ্রমাণ হইল না। তবু বৃথা আশায় থলের বন্ধনগুলা খুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণুর হাতের লেখা—একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর-একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল, যেন আলো যথেষ্ট নাই। কেবলই বাতি উসকাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভালো বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণু তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে-সময় খাইতে গিয়াছিল সেই সময় বেণু এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, "বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দেখিবেন তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমাকে খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর-কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না। সেইজন্য যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া

টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিস—এ আমারই জিনিস।" এ ছাড়া আরো অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন্ জাহাজে বেণু যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুইখানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দুখানাই ইংলন্ডে যাইবে। কোন্ জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কী উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবুরুজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতা শহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ প্রতিকূলতাকে যেন কেবলই প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল—কিন্তু কোথাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মুহূর্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়া গিয়াছে, সেই বাসার সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল—গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্‌বিগ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কোথায় গিয়াছিলে।"

হরলাল বলিয়া উঠিল, "মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।" বলিয়া শুষ্ককণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

"ও মা,কী হইল গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খুলিয়া, শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া, উঠিয়া বসিল। হরলাল কহিল, "মা, তোমরা ব্যস্ত হইয়ো না। আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন—ফাল্গুনের রৌদ্র তাঁহার সর্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া, থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "হরলাল, বাবা হরলাল।"

হরলাল কহিল, "মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও।"

মা রৌদ্রে সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল, "বাবু, এখনই না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।"

হরলাল ভিতর হইতে কহিল, "আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।"

দরোয়ান কহিল, "তবে কখন যাইবেন।"

হরলাল কহিল, "সে আমি তোমাকে পরে বলিব।"

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া নিচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল, 'এ কথা বলি কাহাকে। এ যে চুরি! বেণুকে কি জেলে দিব।'

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল, যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার নহে—ব্রেস্‌লেট, চিক, সিঁথি, মুক্তার মালা প্রভৃতি আরো অনেক দামি গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও তো চুরি। এও তো বেণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও, বাবা।"

হরলাল কহিল, "অধরবাবুর বাড়িতে।"

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, ঐ-যে হরলাল কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে, তাই শুনিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালোই বাসে!

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তবে তোমার আর মফস্বলে যাওয়া হইবে না?"

হরলাল কহিল, "না।" বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাবুর বাড়ি পৌঁছিবার পূর্বেই দূর হইতে শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণ স্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশান্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহাড়া কড়াক্কড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না—সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব। হরলাল খবর পাইল, কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দুই-তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্‌যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতালায় বারান্দায় গিয়া দেখিল, অধরবাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন ও রতিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল, "আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।"

অধরবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়— যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেল।"

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাঁহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকান্ত কহিল, "আমার সামনে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা

করেন, আমি নাহয় উঠি।"

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আঃ, বোসো-না!"

হরলাল কহিল, "কাল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।"

অধর। ব্যাগে কী আছে।

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাস্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ তো! জানিতে, এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে, তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ, সাধুতার জন্য বকশিশ পাইবে?

তখন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি পুলিসে খবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছ। হয়তো পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ। এ ধার আমি শুধিব না।"

হরলাল কহিল, "আমি ধার দিই নাই।"

অধর কহিল, "তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে। তোমার বাক্স ভাঙিয়া চুরি করিয়াছে?"

হরলাল সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল, "ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন-না, তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন।"

যাহা হউক, গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত-পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গেছে। ভয় করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কী হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সম্মুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল, বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরুপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে, এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, গাড়ির ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মফস্বলে গেলে না কেন।"

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড়োসাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে—তিনি

ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল বলিল, "তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল?"

হরলাল 'জানি না' এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল, "টাকা কোথায় আছে দেখিব চলো।"

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গনিয়া চারিদিক খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত ঘর তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই-সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি সাহেবের সামনেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে হরলাল, কী হইল রে।"

হরলাল কহিল, "মা, টাকা চুরি গেছে।"

মা কহিলেন, "চুরি কেমন করিয়া যাইবে। হরলাল, এমন সর্বনাশ কে করিল!"

হরলাল কহিল, "মা, চুপ করো।"

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে রাত্রে কে ছিল।"

হরলাল কহিল, "দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়াছিলাম—আর-কেহ ছিল না।"

সাহেব টাকাগুলা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল, "আচ্ছা, বড়োসাহেবের কাছে চলো।"

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল, "সাহেব, আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে। আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি—আমার ছেলে কখনোই পরের টাকায় হাত দিবে না।"

সাহেব বাংলা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা!"

হরলাল কহিল, "মা, তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ। বড়োসাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি এখনই আসিতেছি।"

মা উদ্‌বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "তুই যে সকাল থেকে কিছুই খাস নাই।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেঝের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড়োসাহেব হরলালকে কহিলেন, "সত্য করিয়া বলো ব্যাপারখানা কী।"

হরলাল কহিল, "আমি টাকা লই নাই।"

বড়োসাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানো কে লইয়াছে।

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে?

হরলাল কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।"

বড়োসাহেব কহিলেন, "দেখো হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোনো জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড়ো লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম— যেমন করিয়া পারো টাকা সংগ্রহ করিয়া আনো—তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।"

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারোটা হইয়া গেছে। হরলাল যখন মাথা নিচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুরা অত্যন্ত খুশি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল একদিন সময় পাইল। আরো একটা দীর্ঘ দিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কী, উপায় কী, উপায় কী—এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কিনা সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রয়স্থান তাহাই এক মুহূর্তে হরলালের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ফাঁসকলের মতো হইয়া উঠিল। ইহার কোনো দিকে বাহির হইবার কোনো পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতিক্ষুদ্র হরলালকে চারিদিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোনো বিদ্বেষও নাই, কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শত্রু। অথচ, রাস্তার লোক তাহার গা ঘেঁষিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে; আপিসের বাবুরা বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না; ময়দানের ধারে অলস পথিক মাথার নিচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর-একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে; স্যাকরাগাড়ি ভরতি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে; একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "বাবু, ঠিকানা পড়িয়া দাও"—যেন তাহার সঙ্গে অন্য পথিকের কোনো প্রভেদ নাই; সেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ক্রমে আপিস বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিস-মহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুরা ট্র্যাম ভরতি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজি হইতে হরলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্র্যাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। শহরের সমস্ত কাজকর্ম, বাড়িঘর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখনো-বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মতো দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে,

কখনো-বা একেবারে বস্তুহীন স্বপ্নের মতো ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল— যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মতো চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্ দব্ করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে—কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল ঐ একটিমাত্র নামই শুষ্ককণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে—মা, মা, মা। আর-কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতি সামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পুলিসের লোক বা আর-কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে।"

হরলাল কহিল, "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন শ্রান্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জানালার উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিত্রাণ তাহাকে চারি দিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল, কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন এক মুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে তো একটা ভয় মাত্র, সে তো সত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না—মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতিসামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে, অপমানের মধ্যে, অন্যায়ের মধ্যে বন্দি করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো রাজা-মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই

খুলিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারি দিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন; তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তাঘাট বাড়িঘর দোকানবাজার একটু একটু করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল—হরলালের শরীর-মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা, তাঁহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল—ঐ গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্‌বুদ্‌ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গীর্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল, "বাবু, ঘোড়া তো আর চলিতে পারে না—কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

কোনো উত্তর পাইল না। কোচবাক্স হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল, হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

'কোথায় যাইতে হইবে' হরলালের কাছ হইতে এই প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না।

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪

অপরিচিতা

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলা পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন এমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এককালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না আমাকেও ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ—বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়ো। কিন্তু, ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো-কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে—বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে

1

আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়্‌গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুঁকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।"

কিছুদিন পূর্বেই এম. এ. পাশ করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই —থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল— আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বল, তবে—"। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।"

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এ-সব ভালো কথা। কিন্তু, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই—বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন—কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্দামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্যন্ত গিয়াছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিস্‌তুতো ভাই। তাহার মত রুচি এবং দক্ষতার 'পরে আমি ষোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!"

বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

২

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এ পারে বা ও পারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়োই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল —ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না—কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম, কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক্‌, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু

ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তার পরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এ-সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যার উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা। এইজন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ—ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদমসুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কন্সর্ট্ প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী দ্বারা সংগীতস্বরসতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে তো কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলা ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং বিপুল-শরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদ্‌গদ বচনে কন্সর্ট্ পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।"

ব্যাপারখানা এই।—সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন—বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া

সওগাদ লোক-বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন—দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাক্‌রাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোশে এবং স্যাক্‌রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেঝেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।"

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, "ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।"

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?"

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এ-সব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

"আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, "অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।"

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোশের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা—হাল ফ্যাশানের সূক্ষ্ম কাজ নয়—যেমন মোটা তেমনি ভারী।

স্যাক্‌রা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, " এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ না—এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।"

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনি তাঁর নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায় দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাক্‌রার হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"

স্যাক্‌রা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।"

শম্ভুবাবু এয়ারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।"

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়ে বোসো গে।"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।"

মামা বলিলেন, "সে কী কথা। লগ্ন—"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "সেজন্য কিছু ভাবিবেন না—। এখন উঠুন।"

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ-ধরনের, কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, "সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।"

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কী বল। বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?"

মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—"

মামা বলিলেন, "তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "ঠাট্টা করিতেছেন নাকি।"

শম্ভুনাথ কহিলেন, "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তার পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অভ্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, 'দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।' কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কি।

সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড় সৎপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ কোন নষ্ট গ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরযাত্রীরা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, 'বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল—পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।'

'বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব' বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল—এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কি যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি—কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেক্ষা— এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া

তুলিয়াছিলাম! বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল; বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল। বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বৈকি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না। যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপর কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না।

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এ দিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল, কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, 'আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।' হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন 'মা, তোর কী হইয়াছে বল্ আমাকে।' মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, 'কই কিছুই তো হয় নি বাবা।' বাপের এক মেয়ে যে—বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, 'বেশ তো' আর একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।' কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, 'যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও—আমি বিরহিনীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।' তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল,

নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল—এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর-সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে? তারপরে আমার কথাটি ফুরালো।

৪

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেল গাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন্ স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন। কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত—আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারি দিকে তাহা যে কতই বহু দূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নিচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিট্‌মিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, "শিগ্‌গির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে।" মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি-মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, এমন তো আর শুনি নাই।'

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম, কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি—চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি

পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটি ধুয়া—'গাড়িতে জায়গা আছে।' আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে—শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনে একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রে নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট— মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্ল্যাটফর্মে সাহেবদের আর্দালি দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন এক ফৌজের বড়ো জেনারেল-সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফার্স্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন্ গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না—এখানে জায়গা আছে।"

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধুয়া—'জায়গা আছে।' ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চলতি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল—গ্রাহ্যই করিলাম না।

তারপরে—কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে—তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি, সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখের পড়িতে পারে। সে নিজের চারিদিকের সকলের চেয়ে অধিক-রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না—ছোটোদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই —তাহারই কোন্-একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝর্না ঝরিয়া পড়ে। তাই সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার।—পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া—আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। গাড়িতে

কোথাও জায়গা নাই। বার বার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল-পূর্বে একজন দেশী রেলোয়ে কর্মচারী নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লট্‌কাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, "এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।"

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, "না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।"

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, "না ছাড়িয়া উপায় নাই।"

কিন্তু, মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, "আমি দুঃখিত, কিন্তু—"

শুনিয়া আমি 'কুলি কুলি' করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল "না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।"

বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাইরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত—স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী মা।"

মেয়েটি বলিল, "আমার নাম কল্যাণী।"

শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

"তোমার বাবা--"

"তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁহার নাম শম্ভুনাথ সেন।"

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

উপসংহার

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি।

কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন।"

সে বলিল, "মাতৃ-আজ্ঞা।"

কী সর্বনাশ। এ পক্ষের মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে— সে যেন কোন্ ওপারের বাঁশি—আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল—সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই-যে রাত্রি অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল 'জায়গা আছে', সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা—জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের পর বৎসর যায়—আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই—আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

কার্তিক ১৩২১।

বদনাম

প্রথম

ক্রিং ক্রিং ক্রিং সাইকেলের আওয়াজ; সদর দরজার কাছে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ইন্‌স্‌পেক্টার বিজয়বাবু। গায়ে ছাঁটা কোর্তা, কোমরে কোমরবন্ধ, হাফ-প্যান্ট্‌পরা, চলনে কেজো লোকের দাপট। দরজার কড়া নাড়া দিতেই গিন্নি এসে খুলে দিলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টার ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ঝংকার দিয়ে উঠলেন— "এমন করে তো আর পারি নে, রাত্তিরের পর রাত্রির খাবার আগলে রাখি! তুমি কত চোর ডাকাত ধরলে, সাধু সজ্জনও বাদ গেল না, আর ঐ একটা লোক অনিল মিত্তিরের পিছন পিছন তাড়া করে বেড়াচ্ছ, সে থেকে থেকে তোমার সামনে এসে নাটের উপর বুড়ো আঙুল নাড়া দিয়ে কোথায় দৌড় মারে তার ঠিকানা নেই। দেশসুদ্ধ লোক তোমার এই দশা দেখে হেসে খুন, এ যেন সার্কাসের খেলা হচ্ছে।"

ইন্‌স্‌পেক্টার বললেন, "আমার উপরে ওর নেকনজর আছে কী ভাগ্যিস। ও বেলে খালাস আসামীই বটে, তবু পুলিসে না রিপোর্ট করে কোথাও যাবার হুকুম নেই, তাই আমাকে সেদিন চিঠিতে জানিয়ে গেল— 'ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু, ভয় পাবেন না, সভার কাজ সেরেই আমি ফিরে আসছি।' কোথায় সভা তার কোনো সন্ধান নেই। পুলিসে ও যেন ভেলকি খেলছে।"

স্ত্রী সৌদামিনী বললে, "শোনো তবে আজ রাত্তিরের খবর দিই, শুনলে তোমার তাক লেগে যাবে। লোকটার কী আস্পর্ধা, কী বুকের পাটা! রাত্তির তখন দুটো, আমি তোমার খাবার আগলে বসে আছি, একটু ঝিমুনি এসেছে। হঠাৎ চমকে দেখি সেই তোমাদের অনিল ডাকাত, আমাকে প্রণাম করে বললে, 'দিদি, আজ ভাইফোঁটার দিন, মনে আছে? ফোঁটা নিতে এসেছি। আমার আপন দিদি এখন চট্টগ্রামে কী সব চক্রান্ত করছে। কিন্তু ফোঁটা আমি চাই, ছাড়ব না, এই বসলুম।'.... সত্যি কথা তোমাকে বলব। আমার মনের মধ্যে উছলে উঠল স্নেহ। মনে হল এক রাত্তিরের জন্যে আমি ভাইকে পেয়েছি। সে বললে, 'দিদি, আজ তিন দিন কোনোমতে আধপেটা খেয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরেছি। আজ তোমার হাতের ফোঁটা তোমার হাতের অন্ন নিয়ে আবার আমি উধাও হব।' তোমার জন্যে যে ভাত বাড়া ছিল তাই আমি তাকে আদর করে খাওয়ালুম। বললুম, 'এই বেলা তুমি পালাও, তাঁর আসবার সময় হয়েছে।' লোকটা বললে, 'কোনো ভয় নেই, তিনি আমারই সন্ধানে চিতলবেড়ে গেছেন, ফিরতে অন্তত তিনটে বাজবে। আমি রয়ে বসে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে যেতে পারব।' বলে তোমারই জন্যে সাজা পান টপ করে মুখে নিলে তুলে। তার

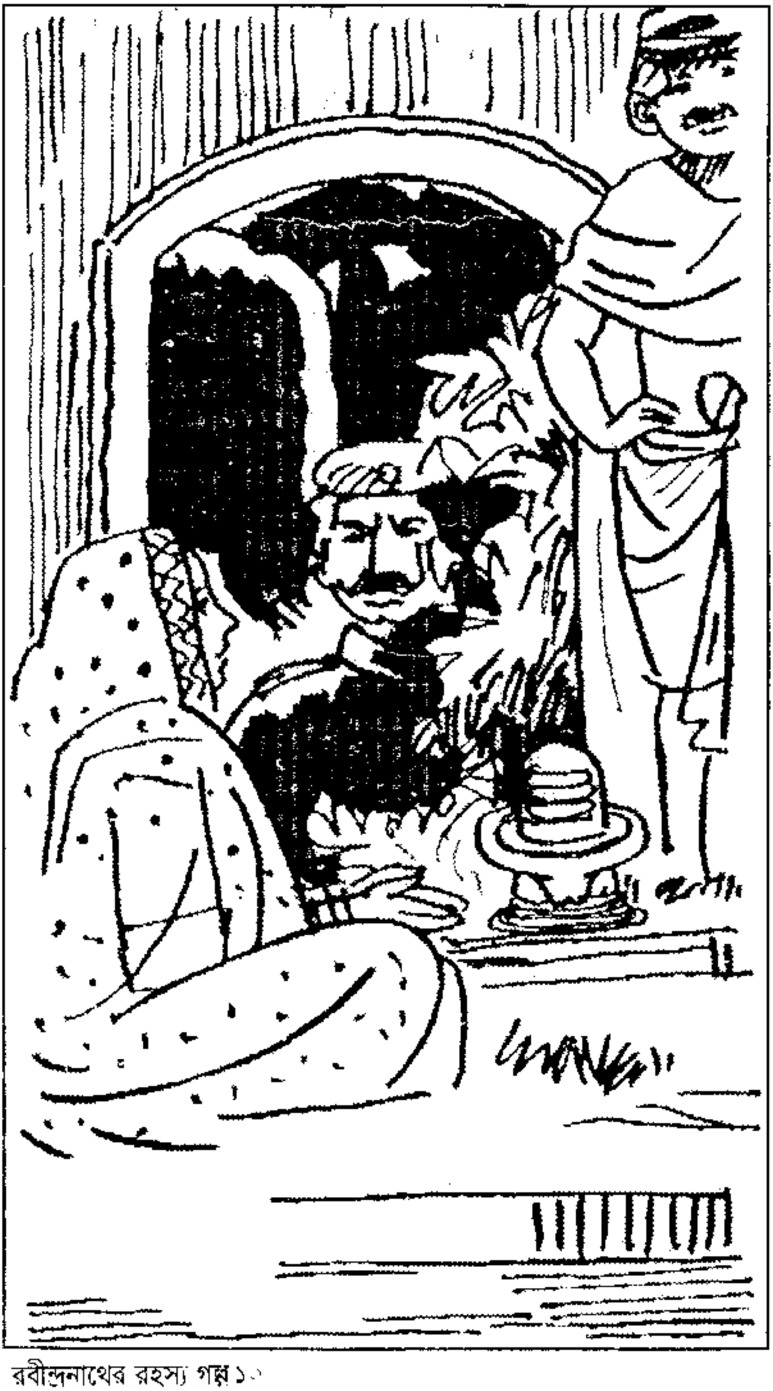

পরে বললে কিনা — 'ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু হাভানা চুরুট খেয়ে থাকেন; তারই একটা আমাকে দাও, আমি খেতে খেতে যাব যেখানে আমার সব দলের লোক আছে; তারা আজ সভা করবে।' তোমার ঐ ডাকাত অনায়াসে, নির্ভয়ে, সেই জায়গাটার নাম আমাকে বলে দিলে।"

ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু বললেন, "নামটা কি শুনতে পারি কি।"

সদু বললে, "তুমি এমন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করলে এর থেকে প্রমাণ হয় তোমার ডাকাত আমাকে চিনেছিল কিন্তু তুমি আজও আমাকে চেনো নি। যা হোক, আমি তাকে তোমার বহু শখের একটি হাভানা চুরুট দিয়েছি। সে জ্বালিয়ে দিব্যি সুস্থ মনে পায়ের ধুলো নিয়ে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে চলে গেল।"

বিজয় বসে ছিলেন, লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "বলো সে কোন্ দিকে গেল, কোথায় তাদের সভা হচ্ছে।"

সদু উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, "কী! এমন কথা তোমার মুখ দিয়ে বের হল। আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি, তাই বলে কি পুলিসের চরের কাজ করব। তোমার ঘরে এসে আমি যদি ধর্ম খুইয়ে বসি, তবে তুমিই বা আমাকে বিশ্বাস করবে কী করে।"

ইন্‌স্‌পেক্টার চিনতেন তাঁর স্ত্রীকে ভালো করে। খুব শক্ত মেয়ে, এর জিদ কিছুতেই নরম হবে না। হতাশ হয়ে বসে নিশ্বেস ফেলে বললেন, "হায় রে, এমন সুযোগটাও কেটে গেল!"

বসে বসে তাঁর নবাবি ছাঁদের গোঁফ-জোড়াটাতে তা দিতে লাগলেন, আর থেকে থেকে ফুঁসে উঠলেন অধৈর্যে। তাঁর জন্য তৈরি দ্বিতীয় দফার খিচুড়ি তাঁর মুখে রুচল না।

এই গেল এই গল্পের প্রথম পালা।

দ্বিতীয়

সদু স্বামীকে বললে, "কী গো, তুমি যে নৃত্য জুড়ে দিয়েছ। আজ তোমার মাটিতে পা পড়ছে না। ডিস্ট্রিক্‌ট্ পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডের নাগাল পেয়েছ নাকি।"

"পেয়েছি বৈকি।"

"কী রকম শুনি।"

"আমাদের যে চর, নিতাই চক্রবর্তী, সে ওদের ওখানে চরগিরি করে। তার কাছে শোনা গেল আজ মোচকাঠির জঙ্গলে ওদের একটা মস্ত সভা হবে। সেটাকে ঘেরাও করবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। ভারী জঙ্গল, আমরা আগে থাকতে লুকিয়ে সার্ভেয়ার পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে সার্ভে করে নিয়েছি। কোথাও আর লুকিয়ে পালাবার ফাঁক থাকবে না।"

"তোমাদের বুদ্ধির ফাঁকের মধ্যে দিয়ে বড়ো বড়ো ফুটোই থাকবে। অনেক বার তো লোক হাসিয়েছ, আর কেন। এবারে ক্ষান্ত দাও।"

"সে কি কথা সদু : এমন সুযোগ আর পাব না।"

"আমি তোমাকে বলছি, আমার কথা শোনো — ও মোচকাঠির জঙ্গল ও-সব বাজে কথা। সে তোমাদেরই ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরছে। তোমাদের মুখের উপরে তুড়ি মেরে দেবে দৌড়, এ আমি তোমাকে বলে দিলুম।"

"তা, তুমি যদি লুকিয়ে তাদের ঘরের খবর দাও, তা হলে সবই সম্ভব হবে।"

"দেখো অমন চালাকি কোরো না। বোকামি করতে হয় পেট ভরে করো, অনেক বার করেছ, কিন্তু নিজের ঘরের বউকে নিয়ে —"

কথাটা চাপা পড়ল চোখের উপর আঁচল চাপার সঙ্গে।

"সদু, আমি দেখছি যে এই একটা বিষয়ে তোমার ঠাট্টাটুকুও সয় না।"

"তা সত্যি, পুলিসের ঠাট্টাতেও যে গায়ে দাঁত বসে। এখন কিছু খেয়ে নেবে কি না বলো।"

"তা নেব, সময় আছে, সব একেবারে পাকাপাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে।"

"দেখো, আমি সত্যি কথাই বলব। তোমরা যা কানাকানি কর তা যদি জানতে পারতুম তা হলে ওদের কাছে ফাঁস করে দেওয়া কর্তব্য মনে করতুম।"

"সর্বনাশ, কিছু শুনেছ নাকি তুমি।"

"তোমাদের সংসারে চোখ কান খুলে রাখতেই হয়, কিছু কানে যায় বৈকি।

"কানে যায়, আর তার পরে?"

"আর তার পরে চণ্ডীদাস বলেছেন, 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিয়া দিল প্রাণ'।"

"তোমার ঐ ঠাট্টাতেই তুমি জিতে যাও, কোন্‌টা যে তোমার আসল কথা ধরা যায় না।"

"তা বুঝবার বুদ্ধিই যদি থাকত তবে এই পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরি কাজ তুমি করতে না। এর চেয়ে বড়ো কাজেই সরকার বাহাদুর তোমাকে লাগিয়ে দিতেন বিশ্বহিতৈষীর পদে, বক্তৃতা দিতে দিতে দেশে বিদেশে জাল ফেলতে।"

"সর্বনাশ, তা হলে সেই-যে মেয়েটির গুজব শোনা যাচ্ছে, সে দেখি আমার আপন ঘরেরই ভিতরকার।"

"ঐ দেখো, কুকুরটা চেঁচিয়ে মরছে। তাকে খাইয়ে ঠাণ্ডা করে আসি।"

ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু মহা খাপ্পা হয়ে বললেন, "আমি এক্ষুনি গিয়ে লাগাব ঐ কুকুরটাকে আমার পিস্তলের গুলি।"

সদু তার স্বামীর কাপড় ধরে টেনে বললে, "না, কক্ষনো তুমি যেতে পারবে না।"

"কেন।"

"তুমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই একেবারে টুঁটি ক্যাঁক্ করে চেপে ধরবে। ও বড়ো বদমাইস কুকুর। ও কেবল আমাকেই চেনে।"

"একটা খবর পেয়েছি সদু, সেই অনিল লোকটা হরবোলা, ও সব জন্তুরই নকল করতে পারে। রোজ রাত্রি দুটোর সময় ওই-যে তোমায় ডাক দিচ্ছে না তাই বা বলি কী করে।"

সদু একেবারে জ্বলে উঠে বললে, "অ্যাঁ, শেষকালে আমাকে সন্দেহ! এই রইল তোমার ঘরকন্না পড়ে, আমি চললুম আমার ভগ্নীপতির বাড়িতে।"

এই বলে সে উঠে পড়ল।

"আরে কোথায় যাও! ভালো মুশকিল! নিজের ঘরের স্ত্রীকে ঠাট্টা করব না, আমি ঠাট্টার জন্যে পরের ঘরের মেয়ে কোথায় খুঁজে পাই। পেলেই বা শান্তি রক্ষা হবে কী করে।"

ব'লে ওকে জোর করে ধরে বসালেন।

সদু কেবলই চোখ মুছতে লাগল।

"আহা, কী করছ, কাঁদ কেন, সামান্য একটা ঠাট্টা নিয়ে!"

"না, তোমার এই ঠাট্টা আমার সইবে না, আমি বলে রাখছি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ব্যস্ — রইল, এখন তুমি আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কুকুরকে খাইয়ে এসো। ও আবার কাটলেট নইলে খায় না, পুডিং না হলে পেট ওর ভরে না। সামান্য কুকুর নিয়ে তুমি অত বাড়াবাড়ি কর কেন আমি বুঝতেই পারি না।"

সদু বললে, "তোমরা পুরুষ মানুষ বুঝবে না। পুত্রহীনা মেয়ের বুকে যে স্নেহ জমে থাকে সে যে কোনো একটা প্রাণীকে পেলে তাকে বুকের কাছে টেনে নেয়। ওকে একদিন না দেখলে আমার মনে কেবলই ভয় হতে থাকে, কে ওকে কোন্ দিক থেকে ধরে নিয়ে গেল। তাই তো আমি ওকে এত যত্নে ঢেকেঢুকে রাখি।"

"কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি সদু, কোনো জানোয়ার এত আদরে বেশি দিন বাঁচতে পারে না।"

"তা, যতদিন বাঁচে ভালো করেই বাঁচুক।"

বিজয়বাবু বিশ্রাম করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পুলিসের দলবল জুটল, চলল সবাই আলাদা আলাদা রাস্তায় মোচকাঠির দিকে। বহু দূরের পথ, প্রায় রাত পুইয়ে গেল যেতে-আসতে।

পরের দিন বেলা সাতটার সময় মুখ শুকিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার বাড়িতে এসে কেদারাটার উপরে ধপাস করে বসে পড়লেন। বললেন, "সদু, বড়ো ফাঁকি দিয়েছে! তোমার কথাই সত্যি। পুলিসের লোক ঘেরাও করলে বন, সে বনে জনমানব নেই। হৈ হৈ লাগিয়ে দিলে; চীৎকার করে বলতে লাগলে, "কোথায় আছ বের হও, নইলে আমরা গুলি চালাব। অনেকগুলো ফাঁকা গুলি চলল, কোনো সাড়া নেই। পুলিসের লোক খুব সাবধানে বনের মধ্যে ঢুকে তল্লাস করলে। তখন ভোর হয়ে এসেছে। রব উঠল, ধর্ সেই নিতাইকে, বদমাইসকে।' নিতাইয়ের আর টিকি দেখা যায় না। একখানা চিঠি পাওয়া গেল, কেবল এই কটি কথা—'আসামী নিরাপদ। দিদিকে আমার প্রণাম জানাবেন। অনিল।' দেখো দেখি কি কাণ্ড, এর মধ্যে আবার তোমার নাম জড়ানো কেন, শেষ কালে" —

"শেষকালে আবার কী। পুলিসের ঘরের গিন্নি কি আসামীর ঘরের দিদি হতেই পারে না। সংসারের সব সম্বন্ধই কি সরকারী খামের ছাপ-মারা। আমি আর কিছু বলব না। এখন তুমি একটু শোও, একটু ঘুমোও।"

ঘুম ভাঙল তখন বেলা দুপুর। স্নান করে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিজয় বসে বসে পান চিবোতে চিবোতে বললেন, "লোকটার চালাকির কথা কী আর তোমাকে বলব। ও দলবল নিয়ে চার দিকে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ও ভোর রাত্তিরে কুম্ভক যোগ করে শূন্যে আসন করে — এটা নাকি অনেকের স্বচক্ষে দেখা। গ্রামের লোকের বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে — ও একজন সিদ্ধপুরুষ, বাব' ভোলানাথের চিহ্নিত। ওর গায়ে হাত দেবে হিন্দুর ঘরে আজ এমন লোক নেই। তারা আপন ঘরের দাওয়ায় ওর জন্য খাবার রেখে দেয় — রীতিমত নৈবেদ্য। সকাল-বেলা উঠে দেখে তার কোনো চিহ্ন নেই। হিন্দু পাহারাওয়ালারা তো ওর কাছে ঘেঁষতেই চায় না। একজন দারোগা সাহস করে হিজলাকান্দির দাঙ্গার পরে ওকে গ্রেপ্তার করেছিল। হপ্তা খানেকের মধ্যে তার স্ত্রী বসন্ত হয়ে মারা গেল। এর পরে আর প্রমাণের অভাব রইল না। সেইজন্য এবারে যখন মোচকাঠিতে ওর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, পাহারাওয়ালারা ঠিক করলে যে ও যখন খুশি আপনাকে লোপ করে দিতে পারে। ও তার একটি সাক্ষীও রেখে গেছে — একটা জলা জায়গায় পায়ের দাগ দেখা গেল, দুহাত অন্তর এক-একটি পদক্ষেপ — দেড় হাত লম্বা। হিন্দু পাহারাওয়ালারা সেই পায়ের দাগের উপরে ভক্তি ভরে লুটিয়ে পড়ে আর-কি! এই লোককে সম্পূর্ণ মন দিয়ে ধরপাকড় করা শক্ত হয়ে উঠেছে। ভাবছি মুসলমান পাহারাওয়ালা আনাব, কিন্তু দেশের হাওয়ার গুণে মুসলমানকে যদি ছোঁয়াচ লাগে তবে আরো সর্বনাশ হবে। খবরের কাগজওয়ালারা মোচকাঠিতে সংবাদদাতা পাঠাতে শুরু করলে। কোন্ পলাতকার এই লম্বা পা, তা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হল। এখন এ লোকটাকে কী করা যায়। এই কিছুদিন

বেলে খালাস পেয়েছিল, সেই সুযোগে দেশের হাওয়ায় যেন গাঁজার ধোঁওয়া লাগিয়ে দিলে। এ দিকে পিছনে প্রোপাগান্ডা চলছেই, নানা রকম ছায়া নানা জায়গায় দেখা যায়। এক জায়গায় মহাদেবের একগাছি চুল পাওয়া গেছে ব'লে আমার ভক্ত কনস্টেবল অত্যন্ত গদ্‌গদ হয়ে উঠেছে। সেটা যে শণের দড়ি সে কথা বিচার করবার সাহসই হল না। ক'দিনের মধ্যে চারদিকে একেবারে গুজবের ঝড় উঠে গেল। মোচকাঠিতে ঐ পায়ের চিহ্নের উপরে মন্দির বানাবে ব'লে একজন ধনী মাড়োয়ারি ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে বসেছে। একজন ভক্ত পাওয়া গেল, তিনি ছিলেন এক সময়ে ডিস্ট্রিক্ট জজ। তাঁর কাছে বসে অনিল ডাকাত শিবসংহিতার ব্যাখ্যা শুরু করে দিলে — লোকটার পড়াশুনা আছে। এমনি করে ভক্তি ছড়িয়ে যেতে লাগল। এবারকার বেলের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পর ওর নামে সাক্ষী জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অনিল ডাকাতকে নিয়ে এই তো আমার এক মস্ত সমস্যা বাধল।

"সদু, তুমি জান বোধ হয় এ দিকে আর এক সংকট বেধেছে। আমার মামাতো ভাই গিরিশ সে হাতিবাঁধা পরগনায় পুলিসের দারোগাগিরি করে। কর্তব্যের খাতিরে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলের হাতে হাতকড়ি লাগিয়েছিল। সেই অবধি গ্রামের লোকেরা তাকে জাতে ঠেল্‌বার মন্ত্রণা করছে। এ দিকে তার মেয়ের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়, যে পাত্রই জোটে তাকে ভাঙিয়ে দেয় গ্রামের লোক। পাত্র যদি জোটে তবে পুরুত জোটে না। দূর গ্রাম থেকে পুরুতের সন্ধান পেল, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সে কখন দিয়েছে দৌড়। এবারে একটা কিনারা পাওয়া গেছে। বৃন্দাবন থেকে এক বাবাজি এসে হঠাৎ আমার হেড কনস্টেবলের বাড়িতে আড্ডা দিলে, সদব্রাহ্মণ, খাইয়ে-দাইয়ে আমরা সবাই মিলে তাঁকে খুশি করাচ্ছি। তাঁকে রাজি করানো গেছে। এখন গ্রামের লোকের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সদু, তুমিও এ কাজে সাহায্য করো।"

"ওমা, করব না তো কী! ও তো আমার কর্তব্য। আহা, তোমাদের গিরিশের মেয়ে, আমাদের মিনু। সে তো কোনো অপরাধ করে নি। তার বিয়ে তো হওয়াই চাই। আনো তোমার বৃন্দাবনবাসীকে, আমি জানি ঐ-সব স্বামীজিদের কী করে আদর যত্ন করতে হয়।"

এলেন বৃন্দাবনবাসী। বুকে লুটিয়ে পড়ছে সাদা দাড়ি, নারদ মুনির মতো। সদু ভক্তিতে গদগদ হয়ে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল, পাড়ার লোক তার প্রণামের ঘটা দেখে হেসে বাঁচে না। প্রবীণা প্রতিবেশিনী মুচকে হেসে বললেন, "সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি তোমার এত ভক্তি হঠাৎ জেগে উঠল কী করে।"

সদু হেসে বললে, "দরকার পড়লেই ভক্তি উথলে ওঠে। বাবাঠাকুরেরা পায়ের ধুলো নিলে গলে যান। মিনুর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমার ভক্তিটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে।"

ঘন ঘন শাঁখ বেজে উঠল, উলুর সঙ্গে বর আসার শব্দ এল চারদিক থেকে। কনেকে একটি চেলী-জড়ানো পুঁটুলির মতো করে এয়োর দল নিয়ে এল ছাঁদনাতলায়। নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা হল। বর কনে বাবাজিকে প্রণাম করে অন্দরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল, তখন বাবাজি আশীর্বাদ শেষ করে বিজয়বাবুকে আর সভার সবাইকে বললেন, "মশায়, আমার খবরটা এবারে দিয়ে যাই। পুরুতের কাজ আমার পেশা নয়। আমার যা পেশা সে আপনার সমস্ত দারোগা-কনস্টেবেলদের ভালো করেই জানা আছে। এখন আপনাদের পুরুতের দক্ষিণা দেবার সময় এসেছে। সে পর্যন্ত আমাব আর সবুর সইবে না। অতএব আপনারা বিদায় করবার আগেই আমি বিদায় নিলেম।"

এই ব'লে সন্ন্যাসী সকলের সামনে দাড়ি গোঁফ টেনে ফেলে তিন লাফে চণ্ডীমণ্ডপের পাঁচিল ডিঙিয়ে উধাও।

সভার লোকেরা হাঁ করে চেয়ে রইল। বিজয়বাবুর মুখে কথা নেই।

বিয়ের ভোজ শেষ হয়ে গেছে, পাড়াপড়শী গেছে যে যার ঘরে। বরবধূ বাসর ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। সদু স্বামীকে বললে, "তুমি ভাবছ কী, যেমন করে হোক কাজ তো উদ্ধার হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী উধাও হয়ে গিয়ে তোমাদেরই তো কাজ হালকা করে দিয়ে গেল। এখন বাসিবিয়ের আয়োজন করতে হবে, চোর-ডাকাতের পিছনে সময় নষ্ট কোরো না। কিন্তু সেই মেয়েটির কোনো খোঁজ পেলে কি।"

"দুঃখের কথা বলব কী, এখন একটি মেয়ের জায়গায় রোজ আমার থানার সামনে পঁচিশটি মেয়ের আমদানি হচ্ছে চাল কলা নৈবেদ্য নিয়ে। এখন কোন্‌টি যে কে খোঁজ করা শক্ত হয়ে উঠল।"

"সে কী, তোমার দরজায় এত মেয়ের আমদানি তো ভালো নয়। ওখানে তুমি কি বাবাজি সেজে বসেছ নাকি।"

"না, লোকটার চালাকির কথা শোনো একবার, অবাক হবে। একদিন হঠাৎ কিষণলাল এসে খবর দিলে অফিসের সামনের রাস্তায় একটি পাথর বেরিয়েছে। তার গায়ে পাড়ার মেয়েরা এসে সিঁদুর লাগাচ্ছে, চন্দন মাখাচ্ছে; কেউ চাইতে এসেছে সন্তান, কেউ স্বামীসৌভাগ্য, কেউ আমারই সর্বনাশ। এই ভিড় পরিষ্কার করতে গেলেই খবরের কাগজে মহা হাঁউমাউ করে উঠবে যে এইবার হিন্দুর ধর্ম গেল। আমার হিন্দু পাহারাওয়ালারাও তাকে পাঁচ সিকা করে প্রণামী দেয়। ব্যবসা খুব জমে উঠল। টাকাগুলো কে আদায় করছে অবশেষে সেটার দিকে চোখ পড়ল। একদিন দেখা গেল — না আছে পাথরটা, না আছে টাকার থালা। আর সেই পাগলা গোছের লোকটা সেও তার সাজ বদলে কোথায় যে গা-ঢাকা দিল সে সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত

গুজব শোনা যেতে লাগল। মুশকিল এই — হিন্দুধর্মের পাহারাওয়ালারা হাঙ্গার-স্ট্রাইকের ভয় দেখাতে থাকে। এই নিয়ে যদি শান্তিভঙ্গ হয় তা হলে আবার সকলের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এখন কোন্‌ দিক সামলাই! আর এক উৎপাত ঘটেছে, একদিন ছেদীলাল এসে পড়ল পুলিসের থানার দরজায় দড়াম করে। হাঁউমাউ করে বললে যে, ভোলানাথের একশিঙওয়ালা ভৃঙ্গীবাবা ষাঁড়ের মতো গর্জাতে গর্জাতে তাকে এসে তাড়া করেছিল। সে তো কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে সন্ন্যাসী হয়ে। গাছতলায় বসে বসে গাঁজা খাচ্ছে। এখন লোক পাওয়া শক্ত হয়েছে। আর ওর সঙ্গে আমরা পেরে উঠি নে, কেননা মেয়েরা ওর সহায়। ও তাদের সব বশ করে নিয়েছে।"

সদু হেসে বললে, "ওর গল্প যতই শুনি আমারই তো মন টলমল করে ওঠে।"

"দেখো, সর্বনাশ কোরো না যেন।"

"না, তোমার ভয় নেই, আমার এত সৌভাগ্য নয়। মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘরকন্না চালাতে হয়, সেটা দেশের সেবায় লাগালে ঐ স্ত্রীবুদ্ধি ষোলো-আনা কাজে লাগতে পারে। পুরুষরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অখলা — এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি আর ঐ খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা অখলা, কুকুরের গলায় শিকলের মতো এই খ্যাতি আমরা গলায় পরে থাকি, আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। তার চেয়ে সত্যি কথা বলো-না কেন — সুযোগ পেলে তোমরাও ঠকাতে জান, সুযোগ পেলে আমরাও ঠকাতে জানি। আমরা এত বোকা নই যে শুধু ঠকবই আর ঠকাব না। বুড়িগুলো ব'লে থাকে 'সদু বড়ো লক্ষ্মী', অর্থাৎ রাঁধতে বাড়তে ঘর নিকোতে সদুর ক্লান্তি নেই। এইটুকু বেড়ার মধ্যে আমাদের সুনাম। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর যাঁরা মানুষের মতো মানুষ তাঁদের হাতে হাতকড়ি পড়ছে, আমরা রেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধ্বীগিরি! আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা কিছু করতে পারি তা হলে আমাদের রক্ষা, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম। আমাদের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দেখো তো দেখবে — হয়তো আছে কোথাও কিছু কলঙ্কের চিহ্ন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে জ্বলন্ত আগুনের দাগা। নিছক আরামের খেলার দাগ নয়। মেরেছি, কিন্তু মরেছি তার অনেক আগে। সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁস্তাকুড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী। বলবে দজ্জাল মেয়ে। এই কলঙ্কের-তিলক-আঁকা ছাপ পড়বে তোমার সদুর কপালে, আর তুমি যদি মানুষের মতো মানুষ হও তবে তার গুমোর বুঝতে পারবে।

"তোমার মুখে ও রকম কথা আমি ঢের শুনেছি, তার পরে দেখেছি সংসার যেমন চলে তেমনি চলছে। মাঝে মাঝে মন খোলসা করা দরকার, তাই শুনি আর হাভানা চুরুট টানি।"

"যাই হোক-না কেন, আমি জানি আমি যাই করি শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা করবেই আর সেই ক্ষমাই যথার্থ পুরুষ মানুষের লক্ষণ, যেন শ্রীকৃষ্ণের বুকে ভৃগুর পায়ের চিহ্ন। তোমার সেই ক্ষমার কাছেই তো আমি হার মেনে আছি। মিথ্যা স্তব করব না — পুলিসের কাজে তোমার খবরদারির শেষ নেই, কিন্তু আমাকে তুমি চোখ বুজে বিশ্বাস করে এসেছ, যদিও সব সময়ে সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা আমার ছিল না। আমি এই জন্যই তোমাকে ভক্তি করি, আমার ভক্তি শাস্ত্রমতে গড়া নয়।"

"সদু আর কেন, পেট ভরে যা বলবার সে তো বলে গেলে, এখন তোমার ঐ কুকুরটাকে খাওয়াতে যাও, বড্ড চেঁচাচ্ছে — ও আমাকে ঘুমোতে দেবে না। আমি ভাবছি আমাকে এবারে ছুটির দরখাস্ত দিতে হবে।"

সদু হেসে বললে, "তুমি ইন্‌স্‌পেক্টরি ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বাবাজি সেজে বোসো, তোমার আয় যাবে বেড়ে, আমিও তার কিছু বখরা পাব।"

"সব তাতেই তুমি যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক, আমার ভালো লাগে না।"

"ও আমার স্বভাব, তোমার খুনী ডাকাতদের জন্য আমি চিন্তা করতে পারব না। একা তোমার চিন্তাতেই আমার দিন চলে গেল। সমস্ত দেশের লোকের হাসিতে যোগ না দিয়ে আমি করব কী। তোমার এই পুলিসের থানায় স্বদেশীদের নিয়ে অনেক চোখের জল বয়ে গেছে, এত দিনে লোকেরা একটু হেসে বাঁচছে। এই জন্যই অনিলবাবুকে সবাই দু হাত তুলে আশীর্বাদ করছে, তুমি ছাড়া। আমি দুশ্চিন্তার ভান করব কী করে বলো দেখি।"

তৃতীয়

"দেখো, সদু, এবারে আমি তোমার শরণাপন্ন।"

সদু বললে, "কবে তুমি আমার শরণাপন্ন নও, শুনি। এই জন্য তো তোমাকে সবাই স্ত্রৈণ বলে। দু জাতের স্ত্রৈণ আছে। এক দল পুরুষ স্ত্রীর জোরের কাছে হার না মেনে থাকতে পারে না, তারা কাপুরুষ। আর এক দল আছে তারা সত্যিকার পুরুষ, তাই তারা স্ত্রীর কাছে অসংশয়ে হার মেনেই নেয়। তারা অবিশ্বাস করতে জানেই না, কেননা তারা বড়ো। এই দেখো-না আমার কত বড়ো সুবিধে — তোমাকে যখন খুশি যেমন খুশি ঠকাতে পারি, তুমি চোখ বুজে সব নাও।"

"সদু, কী পষ্ট পষ্ট তোমার কথাগুলি গো!"

"সে তোমারই গুণে কর্তা, সে তোমারই গুণে।"

"এবারে কাজের কথাটা শুনে নাও — ও-সব আলোচনা পরে হবে। এবারে একটা সরকারি কাজে তোমার সাহায্য চাই। নইলে আমার আর মান থাকে না। পুলিসের লোকরা নিশ্চয়ই জেনেছে এই কাছাকাছি কোথায় এক জায়গায় একজন মেয়ে আছে। সেই এখানকার খবর কেমন করে পায় আর ওকে সাবধানে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। 'সে আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে। ওরা বলছে সে এই পাড়ারই কোনো বিধবা মেয়ে। যেমন করে হোক তার সন্ধান নিয়ে তার সঙ্গে তোমাকে ভাব করতে হবে।"

সদু বললে, "শেষকালে আমাকেও তোমাদের চরের কাজে লাগাবে! আচ্ছা, তাই হবে, মেয়েকে দিয়ে মেয়ে ধরার কাজে লাগা যাবে, নইলে তোমার মুখ রক্ষা হবে না। আমি এই ভার নিলুম। দুদিনের মধ্যে সমস্ত রহস্য ভেদ হয়ে যাবে।"

"পরশু হল শিবরাত্রি, খবর পেয়েছি অনিল ডাকাত সিদ্ধেশ্বরী তলার মন্দিরে জপতপ করে রাত কাটাবে। তার মনে তো ভয়-ডর কোথাও নেই। এ দিকে ও ভারি ধার্মিক কিনা, ও মেয়েটা থাকবে তার কিরকম তান্ত্রিক মতের স্ত্রী হয়ে।"

"তোমরা পুলিসের লোক আড়ালে আড়ালে থেকো, আমি ধরে দেব। কিন্তু রাত্রি একটার আগে যেয়ো না। তাড়াহুড়ো করলে সব ফসকে যাবে।"

অমাবস্যার রাত, একটা বেজেছে। পায়ের-জুতো-খোলা দুটো একটা লোক অন্ধকারে নিঃশব্দে এ দিকে ও দিকে বেড়াচ্ছে। বিজয়বাবু মন্দিরের দরজার কাছে।

একজন চুপিচুপি তাঁকে ইশারা করে ডাকলে, আস্তে আস্তে বললে, "সেই ঠাকুরনটি আজ মন্দিরের মধ্যে এসেছেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। তিনি বিখ্যাত কোনো যোগিনী ভৈরবী। দিনের বেলা কারও চোখেই পড়েন না। রাত্রি একটার পর শুনেছি নটরাজের সঙ্গে তাঁর নৃত্য। একটা লোক দৈবাৎ দেখেছিল, সে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। হুজুর, আমরা মন্দিরে গিয়ে ঐ ঠাকুরনের গায়ে হাত দিতে পারব না। এমন-কি চোখে দেখতেও পারব না — এ বলে রাখছি আমরা ব্যারাকে ফিরে যাব ঠিক করেছি। আপনি একলা যা পারেন করবেন।"

একে একে তারা সবাই চলে গেল। নিঃশব্দ — বিজয়বাবু যত বড়ো একেলে লোক হোন-না কেন, তাঁর যে ভয় করছিল না এ কথা বলা যায় না। তাঁর বুক দুর্‌দুর্ করছে তখন। দরজার কাছ থেকে মেয়েলি গলায় গুন্ গুন্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে: ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং!

বিজয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। ভাবলেন কী করা যায়। এক সময়ে সাহসে ভর করে দিলেন দরজায় ধাক্কা। ভাঙা দরজা খুলে গেল। ভিতরে একটি মাটির প্রদীপ মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে, দেখলেন শিবলিঙ্গের সামনে তাঁর স্ত্রী জোড় হাত

করে বসে, আর অনিল এক পাশে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। নিজের স্ত্রীকে দেখে সাহস হল মনে, বললেন — "সদু, অবশেষে তোমার এই কাজ!"

"হাঁ, আমিই সেই মেয়ে যাকে তোমরা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছ। নিজের পরিচয় দেব ব'লেই আজ এসেছি এখানে। তুমি তো জান আমাদের দেশে দৈবাৎ দুই একজন সত্যিকার পুরুষ দেখা দেয়। তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এঁদের একেবারে নির্জীব করে দিতে। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এই-সব সুসন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক্। তোমার অগোচরে নানা কৌশলে এতদিন এই কাজ করে এসেছি। যাঁর কোনো হুকুম কখনো ঠেলতে পারি নি, সকলের চেয়ে কঠিন আজকের এই হুকুম — এও আমাকে মানতে হবে। এই আমার দেবতাকে আজ তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমি সরে দাঁড়াব। জানি আমার চেয়ে বড়ো রক্ষক তাঁর মাথার উপরে আছেন। দুদিন পরেই সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী রকম নিন্দায় ভরে উঠবে তা আমি জানি। এই লাঞ্ছনা আমি মাথায় করে নেব। কখনো মনে কোরো না চাতুরী করে তোমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে এই মানুষকে আলাদা নালিশে জড়াতে পারবে। আমি চিরদিন তাঁর পিছন পিছন থেকে শাস্তির শেষ পালা পর্যন্ত যাব। তুমি সুখে থেকো। তোমার ভয় নেই, ইচ্ছা করলেই তুমি নূতন সঙ্গিনী পাবে। আর যা কর আমাকে দয়া কোরো না। আমার চেয়ে অনেক বড়ো যাঁরা তাঁদের তুমি তা কর নি। সেই নিষ্ঠুরতার অংশ নিয়ে মাথা উঁচু করেই আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব। প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে, এই তোমাকে জানিয়ে গেলুম। এর পরে হয়তো আর সময় পাব না।"

সদুর কথায় বাধা দিয়ে অনিল বলে উঠল, "বিজয়বাবু, আজ আমি ধরা দেব ব'লেই স্থির করে এসেছিলুম। আমার আর কোনো ভাবনা নেই। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আপনি সদুর কথায় ভড়কাবেন না। ও একটি অসাধারণ মেয়ে, জন্মেছে আমাদের দেশে, একেবারে খাপছাড়া সমাজে। খুব ভালো করেই চিনেছি আমি ওকে, চিনি বলেই আপনাকে বলছি ও নিষ্কলঙ্ক। যে কঠিন কর্তব্য আমরা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছি সেখানে ভালোবাসার কোনো ফাঁক নেই, আছে কেবল আপনাকে জলাঞ্জলি দেওয়া। বিশ্বসংসারের লোক সদু সম্বন্ধে কিচ্ছু জানবে না, আপনার কোনো ভয় নেই। ওকে নিয়ে আপনি মন্দিরের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরুন। আর আমি অন্য দিক থেকে পুলিসের হাতে এখুনি ধরা দিচ্ছি। এই সঙ্গে একটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমাকে আপনারা বাঁধতে পারবেন না। রবিঠাকুরের একটা গান আমার কণ্ঠস্থ —

আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি
তোদের আছে!"

হঠাৎ গেয়ে উঠল বিদেশী গলায়, মন্দিরের ভিত থর থর করে কেঁপে উঠল গলার জোরে। অবাক হয়ে গেলেন ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু।

"এই গান অনেক বার গেয়েছি, আবার গাইব, তার পরে চলব আফগানিস্থানের রাস্তা দিয়ে, যেমন করে হোক পথ করে নেব। আপনাদের সঙ্গে এই আমার কথা রইল। আর পনেরো দিন পরে খবরের কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে বের হবে, অনিল বিপ্লবী পলাতক। আজ প্রণাম হই।"

হঠাৎ বিজয়ের হাত কেঁপে উঠল, টর্চটা মাটিতে পড়ে গেল হাত থেকে। মুখের উপরে দুই হাত চেপে বসে পড়লেন। প্রদীপটাও দমকা বাতাসে শেষ হয়ে গেছে আগেই।

১১-২১ জুন ১৯৪১

আষাঢ় ১৩৪৮

—·—

সেকায়েপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট

২০১৬ শিক্ষা বছরে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের জন্য মুদ্রিত

অষ্টম শ্রেণির পুরস্কার

বিক্রির জন্য নয়